ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভুবনেশ্বরের পথে

১

শশী নিকেতন। জগন্নাথ ধাম। ব্রাহ্ম মুহূর্ত। শীতকাল। পূর্ণিমা। শ্রীম হলঘরে দাঁড়াইয়া আছেন, পশ্চিমাস্য উত্তরের প্রথম দরজার সম্মুখে। ভক্তগণ বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম বলিলেন, আজ সকালে গেলে হয়। দেরী করে কি হবে? অন্ততঃ সাড়ে সাতটার সময় বের হতে হবে। শ্রীম ভুবনেশ্বর যাইবেন। কয়দিন হইতে এই কথা হইতেছে।

আশ্রমের সকল কাজ ক্ষিপ্র গতিতে শেষ হইয়া গেল। জগবন্ধু মনোরঞ্জন ও মুকুন্দ সমুদ্রে স্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। সামান্য জলযোগ করিয়া তাঁহারা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন, স্টেশনে যাইবেন।

ভক্তগণ পদব্রজে চলিতেছেন ঝাউকুঞ্জের ভিতর দিয়া। প্রশস্ত রাজপথ, সুরকির রঙে রঞ্জিত। শীতকাল হইলেও পুরীতে চিরবসন্ত, মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণ বড়ই মধুর। অদূরে সমুদ্রের স্বাস্থ্যবর্ধক সুশীতল মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহ মাঝে মাঝে আসিয়া প্রীতি আলিঙ্গনে ভক্তদের হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রেম সঞ্চার করিতেছে। তাঁহারা বেদের মধু ব্রাহ্মণ আবৃত্তি করিতেছেন।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।
মধুনক্তমুতোষসি মধুমৎপার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ঐ লবণাম্বুর সুগভীর গর্ভ হইতে বালসূর্য নির্গত হইতেছে। আর এই উল্লাসানন্দ, জলধি সুগভীর গর্জনে প্রকাশ করিতেছে। বালসূর্যের জন্ম,

কি অপরূপ শোভা! কি নয়নসুখকর দৃশ্য!

ভক্তগণ চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন, কি সৌভাগ্য আমাদের! এমন পবিত্র মহাতীর্থ! তাহাতে আবার এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য। আর আমাদের সঙ্গে আছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বেদব্যাসতুল্য কথামৃতকার শ্রীম। এই মহাতীর্থে শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ সঙ্গে কত লীলা ও বিহার করিয়াছেন। অবতারের সঙ্গ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই — ঘটিয়াছে তাঁহার পার্ষদদের সঙ্গ। সেই মহাপুরুষ শ্রীম আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন আজ অন্য এক মহাতীর্থে। আমরা সত্যই মহা ভাগ্যবান। পূর্বজন্মের বহু পুণ্যফলে, আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপায় এই সংযোগ হইয়াছে। ভক্তদের এই দিব্য কল্পনাসুখ ভগ্ন করিল ঘোড়ার গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ। মুখ বাহির করিয়া শ্রীম ভক্তদের দেখিতেছেন স্মিতবদনে। স্টেশনের প্রায় সন্নিকটে ভক্তদের সহিত শ্রীম-র দেখা হইল। শ্রীম বলিলেন, একজন গাড়ীতে এলে পারেন। ভক্তগণ পদব্রজেই স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। এখন সকাল সাড়ে সাতটা।

পুরী হইতে ভুবনেশ্বর আটত্রিশ মাইল। খুর্দা সাতাশ মাইল। আর সাক্ষীগোপাল দশ মাইল। সাতটি স্টেশন সব লইয়া — মালতীপুর, দেলাং ও খণ্ডগিরি এবং আরও তিনটি।

স্টেশনের সদর ফটক বন্ধ। তৃতীয় শ্রেণীর ছয়খানা টিকিট ক্রয় করা হইল। বিনয় পার্শেল অফিসের ভিতর দিয়া শ্রীমকে লইয়া স্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুখেন্দুও ঐ পথেই গেলেন। মুকুন্দ, জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন প্রবেশ করিলেন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রবেশপথে।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী। মাঝারি রকমের প্রকোষ্ঠ। পঁচিশজন লোকের বসিবার স্থান। তিন সারি বেঞ্চ। শ্রীম বসিলেন, মধ্য সারির প্রথম স্থানে উত্তরাস্য, সম্মুখে দরজা। গাড়ী পূর্বপশ্চিমে লম্বমান। শীতকাল, পাশে বসিলে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, তাই শ্রীম বসিলেন গাড়ীর মধ্যস্থলে। গাড়ীতে উঠিয়াই শ্রীম মুকুন্দকে সহাস্যে বলিলেন, Because there is no fourth class (যেহেতু চতুর্থ শ্রেণী নাই)। সকলে হাসিতেছেন। পুনরায় হাসিলেন ঐ বাক্যের শেষাংশ শুনিয়া — so we are in the third class. (তাই আমরা বসিয়াছি তৃতীয় শ্রেণীতে)।

স্টেশন হইতে মাটির গ্লাসে করিয়া শ্রীমকে গরম দুধ পান করিতে দেওয়া হইল। তিনি হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, থার্ড ক্লাস। আবার দুধপান। মায়ের দুধ। এ সবই বড় মায়ের দুধ।

একজন হাতকাটা ভিখারী গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীম বলিলেন, দাও একে এক আনা দাও। একজন রামায়ত সাধু চেলাসহ গাড়ীতে উঠিয়াছেন। চেলার চালচলন হাস্যের উদ্রেক করে। শ্রীম সপ্রেমে সাধুকে নমস্কার করিয়া কাছে বসাইলেন। সাধুও প্রতি নমস্কার করিয়া মুচকি হাসিতেছেন। সাধুর বয়স হইবে ত্রিশ। এবার তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল শ্লোক প্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল, আর থামে না। শ্রীমও কৌতুকানন্দে মুচকি হাস্যে ঐ শ্লোক শুনিতেছেন। কখনও নেত্র উপরে টানিয়া কল্পিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আর সাধু অধিকতর উৎসাহিত হইয়া ঝড়ের মত শ্লোকতরঙ্গের অবতারণা করিতে লাগিলেন। উহা থামে না।

শ্রীম ভক্তদিগের প্রতি নয়নভঙ্গিতে ইঙ্গিত করিয়া ঠাকুরের কথা স্মরণ করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেন, এক ক্লাসের সাধু আছে তাহারা কেবল শ্লোক ঝাড়ে। ঐ পর্যন্ত উহাদের কাজ। ধারণা নাই। শ্রীম কখনও ভক্তদের বলেন, ঠাকুরের কতকগুলি শ্লোক কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু বলতেন না পাছে ভক্তরাও ঐ করে বেড়ায়।

গাড়ী ছাড়িল আটটা বিশ মিনিটে। কিন্তু সাধুমহারাজের ঐদিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহার শ্লোকপ্রবাহ অব্যাহত। গাড়ীর বেগ অধিক, কি সাধুমহারাজের কণ্ঠবেগ অধিক, তাহা বলা কঠিন। সাক্ষীগোপাল স্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। সাধুজীর হুঁস নাই। তিনি শ্লোকাবৃত্তির আনন্দে নিমগ্ন। এখন আবার মাঝে মাঝে শ্লোকের ব্যাখ্যাও চলিতে লাগিল। 'গাড়ী আসিল' — চেলার এই কথায় সাধুর হুঁস ফিরিয়া আসিল। তাই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাক্ষীগোপাল স্টেশনে নামিয়া পড়িলেন চেলাসহ, শ্রীমকে নমস্কার করিয়া। হয়তো সাধু মনে করিলেন, এমন সমঝদার শ্রোতা মেলা কঠিন। অজ্ঞাতে সাধু নিশ্চয় অনুভব করিয়াছেন এই বৃদ্ধ সমঝদার শ্রোতা অতিমানব। নহিলে তিনি কেন নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন কোন বাহ্য চিহ্নবিবর্জিত ভেকহীন, ও সাধারণ পোশাক পরিহিত শ্রীম-র নিকট? সাধুটি ওড়িয়া। তাঁহার মাথায় একটি কাল কম্বল জড়ান।

একটি ভক্ত আপন মনে চিন্তা করিতেছেন বিস্ময়ে শ্রীম-র এই সশ্রদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া — কি করিয়া শ্রীম অতক্ষণ এই অপরিপক্ক যুবকের ধর্মোপদেশ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন। ধন্য ধৈর্যের! শ্রীম-র মনে পূর্ণ শ্রদ্ধা, পূর্ণ বিশ্বাস — সাধু নারায়ণের সচল মূর্তি। দেখিতেছি, শ্রীম স্বীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হাতে আনিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সাধুমাত্রেই নারায়ণের মূর্তি। তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। সাধুরা কেহ তমোমুখ, কেহ রজোমুখ, কেহ সত্ত্বমুখ। কিন্তু একই নারায়ণ। গুণভেদে প্রকাশ তিন প্রকার।

গাড়ী চলিতেছে পূর্বদিকে। রেললাইনের পাশে বাম হাতে একটি বিস্তীর্ণ জলাভুমি। ইহার নাম লক্ষ্মীজলা। এখানে জগন্নাথের সেবার ধান্য উৎপন্ন হয়। ভক্তগণ গাড়ীর ভিতর দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? ভক্তগণ বলিলেন, ওই মন্দিরশীর্ষ দর্শন হইতেছে। আর এই লক্ষ্মীজলা। গাড়ীর দরজা ভক্তগণ খুলিয়া দিলেন, শ্রীমও প্রণাম করিলেন। বলিলেন — আচ্ছা, অত জলে ধান হয় কি করে, ডুবিয়ে ফেলে না জলে গাছগুলি? একটি ওড়িয়া যুবক পরিষ্কার বাংলায় শ্রীমকে বুঝাইয়া দিল। বলিল, জল যখন কম থাকে তখন ধানের চারা পুঁতে দেওয়া হয়। তারপর বৃষ্টির জল জমলেও ধানগাছ ডুবে না। এখানে জোয়ার ভাঁটা নাই।

গাড়ী হইতে নামিবার সময় শ্রীম-র কথায় ভক্তগণ ঐ সাধুটিকে দুই আনা পয়সা দিলেন। সাধুরা সাক্ষীগোপাল মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। গাড়ী চলিতেছে। রেল গুমতিতে সাধুরা আবার শ্রীমকে যুক্তকরে প্রণাম করিলেন।

একটি ভক্ত পুনরায় ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার! সাধুটি শ্রীমকে চিনিতে পারিয়াছেন মহাপুরুষ। শ্রীম-র পোশাক সাধারণ গৃহস্থ ভক্তের পোশাক। গায়ে ওয়ার-ফ্ল্যানেলের ঢিলাহাতা পাঞ্জাবী। পায়ে কাল বার্নিশ করা পুরাতন চটিজুতা। পরনে থানকাটা সাদা ধুতি। কোমরে জড়ান নক্সাপাড়ের আটপৌরে ধুতি। মাথায় জড়ান ওয়ার-ফ্ল্যানেলের কম্ফোর্টার। গায়ে জড়ান রাজস্থানী বালাপোষ। আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু। উন্নত ললাট। সুমুখঠেলা দু'টি বৃহৎ চক্ষু যেন ভক্তিরসে ডুবিয়া আছে। ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুইটি বিশাল চক্ষুকে বলিতেন দুইটি শালগ্রাম। আর তাহাতে তিনি এই বিশ্বকে প্রতিফলিত দেখিতেন।

বাহ্য পোশাকে শ্রীম-র ধর্মজীবনের কোনও চিহ্ন নাই। কিন্তু ঐ সাধুটি কি করিয়া শ্রীমকে চিনিলেন — এই কথা ভক্তটি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। মনে মনে বিচার করিতেছেন, না চিনিলে গৃহস্থবেশধারী একজন বৃদ্ধকে ঐ সাধু কেন বারবার প্রণাম করিতেছেন? ভক্ত শেষে স্থির করিলেন, এ বস্তুর গুণ। আগুনের কাছে বসিলে গরম লাগে। বরফের কাছে বসিলে শীতল বোধ হয়। ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব। তেমনি যথার্থ ব্রহ্মদ্রষ্টা আচার্যের কাছে বসিলে প্রাণে প্রাণে ঐ পবিত্র দিব্য স্পর্শ অনুভব হয় নিশ্চয়। তাহা না হইলে কি করিয়া সাধু শ্রীমকে চিনিলেন? ভক্তগণও কেহ তাঁহাকে শ্রীম-র পরিচয় দেন নাই।

গাড়ীতে বসিয়াই শ্রীম সাক্ষীগোপালের মন্দির দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। একজন যাত্রী শ্রীমকে বলিতেছেন, একবার ভগবান গোপাল একজনের মকদ্দমায় মানুষ সেজে সাক্ষী দিয়েছিলেন। তাই বলে সাক্ষীগোপাল। একজন ব্রাহ্মণ বাক্‌দান করেছিল তার কন্যার বিবাহ দিবে অন্য একজন লোকের কাছে। দিন যায়, কিন্তু বিবাহ দিচ্ছে না। আর বাক্‌দানের কথা অস্বীকার করে। নিরুপায় হয়ে কন্যাপ্রার্থী রাজদ্বারে অভিযোগ করল। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে কেউ সাক্ষী দিতে চায় না। অগত্যা সে বিচারককে বলল, গোপালের মন্দিরে বসে বাগদান করেছিল। ইহা গোপাল জানেন। কি আশ্চর্য ওখানেই হঠাৎ সকলের সামনে গোপাল এক ব্যক্তির রূপ ধারণ করে শপথ করে বললেন, হাঁ আমার সামনে এই বাগদান হয়েছে। তখন সে রাজ-আজ্ঞায় ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করে।

গাড়ী চলিতেছে পূর্ব দিকে। একটু পরই দেলাং স্টেশন। গাড়ীর দক্ষিণ দিকে এক উচ্চ নির্জন স্থানে একটি বৃক্ষকুঞ্জ দেখিয়া শ্রীম ভক্তদিগকে বলিতেছেন, ঐ দেখ, কি সুন্দর তপোবন!

যাহা দেখেন, যাহা বলেন, যাহা করেন সবেতেই শ্রীম বালকের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সকল ব্যাপারই সরস ও সজীব। ভিতরে আনন্দময় জাগ্রত থাকিলেই কেবল এইরূপ আচরণ সম্ভব।

২

শ্রীম বেঞ্চের উপর যোগাসনে বসিয়া আছেন। আপন মনে কি ভাবিতেছেন। কিছুক্ষণ পর গান ধরিলেন। শিবদর্শনে চলিয়াছেন। তাই প্রথমে শিবের গান। এ সবই ঠাকুরের গাওয়া গান। শ্রীম অন্য গান প্রায় গাহেন না — যে গান ঠাকুর গাহিয়াছেন, অথবা অপরে গাহিয়াছেন আর ঠাকুর শুনিয়াছেন, এমন গান ছাড়া। তিনি ভক্তদেরও তাহাই করিতে বলেন। বলেন, ঠাকুরের মুখ দিয়ে যে গান বের হয়েছে, তা বেদমন্ত্র। তাঁর শক্তি ঐ গানে সংপ্লুত রয়েছে। সেই শক্তি গায়কের হৃদয়কমল বিকশিত করে দেয়। যে গান শুনছেন তাতেও তাঁর শক্তি নিহিত থাকে। এই গান গাইলেও অন্তর্যামী জাগ্রত হন। এ সবই শক্তিশালী বেদমন্ত্র।

শ্রীম ভাবোন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন —

গান। শিবশংকর বম্ বম্ ভোলা।
বিভূতিভূষণ, দেবত্রিলোচন, বৃষরাজ রাজে বামে গিরিবালা;
রাজ রাজেশ্বর দেবাদিদেব হর
ঢুঁড়ে শ্মশান ঘোরে যোগীরাজবর
জটোজুটধর, বাস বাঘাম্বর, করে শূল, গলে হাড়মালা॥
প্রেমানন চারু ভাবে ঢল ঢল, আঁখি ছল ছল ভকতবৎসল;
করুণ নয়নে, হেরি ভক্তজনে, হরিছে ভবেশ ভবজ্বালা॥

গান। শম্ভু স্বয়ম্ভু শম্ভু স্বয়ম্ভু। ইত্যাদি।

গান। শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা মা,
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না।।

গান। সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে॥
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান শুঁড়িতে চোয়ায় ভাটী পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মিলে॥

দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীম মত্ত হইয়া এই গানটি গাহিতেছেন। এইবার গান শেষ করিলেন নিম্নের গানটি গাহিয়া।

গান। সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ মোর। ইত্যাদি।

শ্রীম গানে মত্ত। গাড়ী আসিয়া থামিল খুর্দা জংশনে। চক্ষু মেলিয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন স্টেশন এটা? ভক্তরা বলিলেন, এটা খুর্দা জংশন। শ্রীম পুনরায় কহিলেন, এখানে আমাদের একটি ফ্রেণ্ড আছেন। দেখা করলে বেশ হতো। শ্রীম গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। স্টেশনের বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন যদি দৈবাৎ ভক্তের সঙ্গে দেখা হয়।

অন্তেবাসী একজন মাদ্রাজী রেলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজেনবাবুর বাসা কোথায়? তিনি বলিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। রিফ্রেশমেন্ট রুমের সামনে স্টেশন মাস্টারকে দেখাইয়া বলিলেন, 'Ask him please' (এঁকে জিজ্ঞাসা করুন)। স্টেশন মাস্টার একটু অগ্রসর হইয়া বাসা দেখাইয়া দিলেন। অন্তেবাসী ও সুখেন্দু দৌড়িয়া গিয়া রাজেনবাবুকে সংবাদ দিলেন। রাজেনও দৌড়িয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

তিনি শ্রীম-র সঙ্গে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। প্রথমে রেলের নানা সংবাদ দিলেন। কখনও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, ঘরের উনি অসুস্থা। প্রায় বিছানাতেই শুয়ে থাকেন, ইত্যাদি। শ্রীম প্রশান্তভাবে ভক্তের দুঃখের কথা শুনিয়া সমবেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে চক্ষু মুদ্রিত করেন। হয়তো ভক্তের দুঃখ দূর করার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন। রাজেনকে বলিলেন, এই হাল সংসারের। তাঁকে বলুন। তিনি দুঃখ দূর করবেন। ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি থাকেন। রাজেন মাঝে মাঝে পুরী গিয়া শ্রীমকে দর্শন করেন। কখন সাধুদের দর্শন করেন। রাজেন প্রণাম করিয়া নামিয়া পড়িলেন। বলিলেন, ফিরবার সময় এসে আবার দর্শন করবো। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

খুর্দা জংশন মাদ্রাজ যাইবার রেলদ্বার। গাড়ী আসিতেছে, আবার যাইতেছে। কেহ উঠিতেছে, কেহ নামিতেছে। শ্রীম-র কক্ষে একজন নূতন লোক উঠিয়াছে উড়িষ্যাবাসী। বয়স পঞ্চাশ। মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার রেখা। মাথার পশ্চাতে উৎকলবাসীর মত চুলের ঝুঁটি। গালে পান। গ্রাম্য লোক। শ্রীম আদর করিয়া তাহাকে নিজের কাছে বসাইলেন। প্রশান্তচিত্ত শ্বেত

শ্মশ্রুশোভিত শ্রীম-র স্নেহস্পর্শে ঐ লোকটির হৃদয় বিগলিত হইল। সে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিল শ্রীম-র কাছে। অতি কাতর কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল তাহার দুঃখের কথা।

উৎকলবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — বাবাজী, মোর বড় কষ্ট হউছি। মোর পুয়র দেহ ভল নাহি। টেলিগ্রাম আসিথিলা। সে পোস্টমান। মু তাঙ্ক পাখে যাউছি। ভল হব তো? আপন আশীর্ব্বাদ করন্তু।

শ্রীম (সমবেদনার সহিত) — ভাল হবে। তুমি শান্ত হও। আচ্ছা তার চিঠি প্রায়ই পাও?

উৎকলবাসী — আইজ্ঞা হঁ।

শ্রীম — কবে পেয়েছে শেষ চিঠি?

উৎকলবাসী — আশ্বিন মাসেরে পোস্টমাস্টার 'তার' দেইথিলে পয়সা কিছি লাগিলানি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — পোস্টমাস্টার তার করেছে। পয়সা লাগে নাই। তাহলে serious (সঙ্কটাপন্ন) নয়, বোঝা যাচ্ছে। অসুখ হয়েছে। খবর দিলে। আপনার লোক গিয়ে দেখুক। তেমন বেশী নয় অসুখ।

শ্রীম (উৎকলবাসীর প্রতি) — তোমার ছেলে ভাল হবে। তুমি গেলেই ভাল হবে। ভক্তগণ অবাক।

উৎকলবাসী (কৃতজ্ঞতার সহিত) — আপন যেতেবেরে কহুছন্তি তো ভল হব।

শ্রীম (আত্মগোপন করিয়া) — না, পয়সা দিয়ে যখন তার করে নাই, তখন serious (সঙ্কটাপন্ন) নয়।

একটি ভক্ত (স্বগত) — কি আশ্চর্য! এই আর একটি ঘটনা। শ্লোক ঝাড়া সাধু, না হয় শ্রীমকে ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষ বলিয়া অনুমান করিলেন। কিন্তু এই নিরক্ষর কৃষক কি করিয়া বুঝিল, এই বৃদ্ধ লোকটি ঈশ্বরীয় লোক? শ্রীম-র পোশাকে বা কথায় ধর্মের কোনও চিহ্ন নাই। তবে ঐ দুইটি চক্ষু — যাহাকে ঠাকুর শালগ্রাম বলিতেন আর যাহাতে ঠাকুর বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন — দেখিলে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে এই বৃদ্ধ লোকটি বলিয়া লোকের অনুমান হয়। আর আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু ও উন্নত প্রশস্ত মুখমণ্ডলে প্রশান্তির প্রেমময় ছবি। আর বস্তুর সান্নিধ্য, এই দুইটিও অতিমানব

বলিয়া অনুমানের অন্যতম কারণ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই জন্য ঠাকুর বলতেন, এই সব জেনে আগে থেকে, তারপর সংসারে যেতে হয়। নরেশবাবুকে বলেছিলেন, সংসারে এই সুখ দুঃখ থাকবেই। মেঘ উঠবেই। তাই বলেছিলেন, আগে সাধুসঙ্গ করে, তপস্যা করে, ভক্তি লাভ করে সংসার কর। তাহলে অত বিচলিত হবে না শোক দুঃখে। আর সর্বদা স্মরণ রাখা ঠাকুরের মহাবাক্য, ঈশ্বর নিত্য সংসার অনিত্য।

গাড়ী পূর্বদিকে চলিতেছে। পরের স্টেশন খণ্ডগিরি। ভক্তরা আলোচনা করিতেছেন খণ্ডগিরি গাড়ীর কোন দিকে। মনোরঞ্জন বলিলেন দক্ষিণে। একজন ওড়িয়া যাত্রী বলিলেন উত্তর দিকে। গাড়ী স্টেশনে থামিলে অন্তেবাসী নামিয়া দুইজন লোককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা দেখাইয়া দিল উত্তর দিকে খণ্ডগিরির শুভ্র মন্দির। খণ্ডগিরিতে পাহাড় কাটিয়া গুহা তৈরী হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে জৈন সাধুগণ তপস্যা করিতেন।

ভুবনেশ্বর চলিয়াছে গাড়ী। গাড়ীতে বসিয়াই বৃক্ষকুঞ্জের ফাঁক দিয়া খণ্ডগিরির একটি ধবল মন্দির দেখা যাইতেছে। ইহার পরই দেখা গেল একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরশীর্ষ — সগর্বে মস্তক উন্নত করিয়া সকল বন ও গ্রামের উপরে অবস্থিত। যেন বলিতেছে, যদি গর্ব করিতে চাও, যদি অভিমান কর, যদি বড় বলিয়া জগতে বিদিত হইতে চাও, তবে শ্রীভগবানের কাছে ছোট হও। তাঁহার দাসত্ব স্বীকার কর, সর্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার পরিচয়ে পরিচিত হও। জাগতিক পরিচয় বৃথা, ক্ষণভঙ্গুর। ভগবানের পরিচয় অনন্তকাল স্থায়ী।

গাড়ী এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই মঠ স্থাপন করেন ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে। বনভূমির অভ্যন্তরে নির্জন স্থান, সাধনভজনের খুব উপযোগী।

ভুবনেশ্বর স্টেশনে সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। শ্রীম গো-যানে আরোহণ করিলেন, সঙ্গে সুখেন্দু ও সামান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। দেড় মাইল দূরে অবস্থিত লিঙ্গরাজের মন্দির পর্যন্ত গাড়ীর ভাড়া সাত আনা। মুকুন্দ, বিনয়, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু দ্রুতপদে চলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ

মঠে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, শ্রীম-র আসার সংবাদ দেওয়া। স্টেশন হইতে ঠাকুরসেবার জন্য কিছু মিষ্টি লওয়ার ইচ্ছা ছিল ভক্তদের। কিন্তু পাওয়া গেল না। দোকানদার বলিল, এক সের ভাল সন্দেশ ছিল। উহা 'বেলুড় মঠে' লইয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোক এই মঠকে বেলুড় মঠ বলে।

বেলা সওয়া এগারটা। ঠাকুরের ভোগ হইয়া গিয়াছে। ইহা এখন ব্রহ্মানন্দ-গৃহে নিবেদন করা হইয়াছে। ভক্তরা ব্রহ্মানন্দ-গৃহে ভোগদর্শন ও প্রণাম করিলেন। ঠাকুরঘর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীম-র আগমনবার্তা শুনিয়া মঠের সাধুগণ আনন্দে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীম-র গাড়ী আসিতেছে না দেখিয়া ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। শ্রীম হয়তো লিঙ্গরাজ দর্শনে চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া ভক্তগণ মন্দিরের দিকে চলিলেন।

জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন কখনও দ্রুতপদে, কখনও দৌড়িয়া চলিলেন মন্দিরের দিকে। মুকুন্দ এবং বিনয়ও চলিয়াছেন ঐদিকে ধীরে ধীরে। বিন্দু সরোবরের পূর্ব তীর দিয়া তাঁহারা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। চঞ্চল চিত্তে তাঁহারা বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ তীর দিয়া চলিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আসিলেন, শ্রীম-র কোনও সন্ধান মিলিল না। কিন্তু সেস্থান হইতে তাঁহারা বিনয় ও মুকুন্দকে সরোবরের বায়ুকোণে দেখিতে পাইলেন। তাই যে রাস্তায় গিয়াছিলেন সেই রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়া ধর্মশালার সম্মুখে বিনয় ও মুকুন্দের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহারাও শ্রীম-র সন্ধান জানেন না।

সকলে মিলিয়া পুনরায় মন্দিরে গেলেন। শ্রীম সেখানেও নাই। এবার জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন সরোবরের পূর্ব তীর ধরিয়া উত্তরের দিকে চলিয়াছেন। খানিক পর মনোরঞ্জন ফিরিয়া চলিলেন মন্দিরে। কিন্তু জগবন্ধু একাকী উত্তর দিকে চলিলেন পূর্ব তীর দিয়া। একটু পরই তিনি দেখিলেন, শ্রীম বাম হাতে সরোবরের পূর্ব তীরের ঘাটে একটি উঁচু পাথরের উপর বসিয়া তর্পণ করিতেছেন। কি বিস্ময়, কি আনন্দ! তিনি ডাকিলেন, মনোরঞ্জন ফিরিয়া আসিলেন।

শশী নিকেতন, পুরী।
২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৪ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

চতুর্দশ অধ্যায়
লিঙ্গরাজ মন্দিরে

১

শ্রীম দক্ষিণাস্য লিঙ্গরাজ মন্দিরে চলিয়াছেন। তাঁহার ডান দিকে বিন্দু সরোবর। সঙ্গে জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন। কোণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মন্দিরশীর্ষ ও মন্দিরগাত্র দর্শন করিতেছেন। ডান হাতে নিকেলের চশমা, এক একবার চক্ষুতে লাগাইতেছেন। বলিলেন, এক রকমই দেখছি (পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দির)। এটি একাদশ শতাব্দীর। আর পুরীর মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীর। ১১৮৯ খ্রীস্টাব্দে পুরীর মন্দিরের নির্মাণ সমাপ্ত হয়। অনঙ্গ ভীমদেব সেই বৎসর সিংহাসনে বসেন। ১ ২২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজ্যকাল সমাপ্ত হয়।

শ্রীম-র পায়ের কাছে একটি কুকুরের বাচ্চা বসিয়া আছে। তিনি আগাইয়া চলিলেন দক্ষিণ দিকে। শ্রীম-র বাম হাতে পার্বতী সরোবর। এখানে শত শিবমন্দির আছে। প্রশস্ত চাতালে দাঁড়াইয়া তিনি সরোবর দর্শন করিতেছেন। জল সামান্য। মন্দির ও ঘাট সব সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়।

লিঙ্গরাজের মন্দিরের দিকে শ্রীম যাইতেছেন। পথের বাম দিকে একটি সাধু আসনে বসিয়া আছেন। যাত্রীদের কপালে সাধু বিভূতির তিলক দেন। আর যাত্রীগণ দুই একটা পয়সা দেয়। শ্রীমকে সাধু ডাকিতেছেন। তিনি বিনা আপত্তিতে কপালে বিভূতির তিলক লইলেন। ভক্তদের কাহারও কাহারও আপত্তি থাকিলেও শ্রীমকে অনুকরণ করিয়া কপালে বিভূতির তিলক লইলেন, ‘যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠ’ — গীতার (৩-২১) এই বাণী স্মরণ করিয়া। সাধুকে ভক্তরা দুইটি পয়সা দিলেন।

শ্রীম এইবার মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। সিংহদ্বারের সম্মুখে কতকটা স্থান বৃহৎ প্রস্তরে বাঁধান। তাহার পূর্বে প্রস্তরের উচ্চ সিঁড়ির মত স্থান।

শ্রীম সিঁড়ির প্রথম প্রস্তরখণ্ডটিকে উত্তরের দিক হইতে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। তারপর সেই হস্ত মস্তকে ও কপালে লাগাইলেন। ইহার পরই সমতল চাতাল। তাহার ডান হাতে পুষ্পবিক্রেতাগণ। তাহাদের নিকট হইতে দুইটি ঠোঙ্গাতে ফুল লওয়া হইল। ফুল দেখিতে সিঙ্গারা ফুলের মত। দাম এক পয়সা।

শ্রীম সিংহদরজায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে কলসীতে অভিষেকের জল লইয়া দশজন সেবক মন্দিরে আসিতেছে। জলের উপর আচ্ছাদন বৃহৎ একটি ছত্র। শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মঙ্গলধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত। ভগবানের জন্য যাহা করা হয় সেই কার্যই শুভ ও পবিত্র। লোক সেই কার্যকে পূজার অঙ্গ মনে করিয়া সম্মান করে। শ্রীমও তাই ভক্তসঙ্গে যুক্তকরে দাঁড়াইলেন দক্ষিণাস্য, ফটকের ভিতরে, দরজার একটু পশ্চিম দিকে। ভগবান যেন মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন — শ্রীম-র এই সশ্রদ্ধ ভাব। শ্রীম ভক্তগণকে সর্বদা ঠাকুরের কথায় বলেন, যেমনি ভাব তেমনি লাভ। আরও বলেন, মনকে শ্রদ্ধা দ্বারা এইরূপে রঞ্জিত করিতে করিতে ভক্তিলাভ হয়। বলেন, মনই আসল। এই মনকে তৈরী করার জন্য এইসকল বাহ্য আচরণের প্রয়োজন।

সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে বাম হাতে গণেশের মন্দির। শ্রীম ভক্তসঙ্গে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেবতাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। বলিলেন, সব স্থানে প্রণামী দাও। এর পরই নৃসিংহমন্দির। শ্রীম বাহির হইতেই যুক্তকরে প্রণাম নিবেদন করিলেন। ইহার পর লিঙ্গরাজের রন্ধনশালা।

দক্ষিণ দরজা দিয়া শ্রীম শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভক্তগণ। দরজার পাশে একটি তালাবন্ধ বাক্স আছে। লেখা আছে, প্রত্যেককে দুই পয়সা করিয়া দিতে হইবে এই বাক্সে, মন্দির সংস্কারের জন্য। ছয়জনের জন্য তিন আনা পয়সা এই বাক্সে দেওয়া হইল।

শ্রীম গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সব অন্ধকার। মিট্‌মিট্‌ করিয়া এখানে কয়েকটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে অন্ধকার আরও সুগভীর হইয়াছে। শ্রীম-র সঙ্গে পাণ্ডা। তিনি লিঙ্গরাজের সম্মুখে দরজার বাম পাশে বসিয়া পড়িলেন। তারপর পুষ্প ও বিল্বপত্রের অর্ঘ শিবের উপর দিয়া দুই হাতে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, আর দুই আনা

প্রণামী দিলেন।

শিবলিঙ্গ একদিকে এক ফুট উচ্চ, বাকী অংশ গড়ান — একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। পাণ্ডারা দীপক দিয়া দেখাইতেছে। আর বলিতেছে, এই দেখ গঙ্গা, এই যমুনা আর এই সরস্বতী। এইবার দীপ সাহায্যে শ্রীম পরিক্রমা করিতেছেন। শিবের পরিক্রমা তিন দিকে করিতে হয়। গৌরীপট্ট উল্লঙ্ঘন করা অবিধেয়। শ্রীম পরিক্রমা করিতেছেন। পায়ে যেন কি লাগিয়া গেল। পাণ্ডা দীপ দিয়া দেখিল, কিছু নাই। শ্রীম বাহিরে আসিলেন মুক্ত হাওয়ায়। শীতকাল, তবুও শ্রীম ঘর্মাক্ত কলেবর।

শ্রীম এইবার মন্দিরের অঙ্গনস্থিত দেবদেবীকে দর্শন প্রণাম ও পরিক্রমা করিতেছেন। প্রথমে দর্শন করিলেন অবতারাদির মন্দির, বিশ্বকর্মার মন্দির ও দেবীমন্দির। এবার ভুবনেশ্বরীকে নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া দর্শন ও অর্ধভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

এইবার বৃষরাজ নন্দীকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে আসিলেন। এখানে পাণ্ডারা প্রসাদ দিলেন মালপোয়া ও সন্দেশের ঢেলা। উহা আহার করিতে করিতে ফটকের পাশে গণেশের মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। এইস্থান হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই স্থানেই শেষ হইল। এখানে বসিয়া জলপান করিলেন। শ্রীম বেশ পরিশ্রান্ত, কিন্তু মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট থাকায় পরিশ্রমবোধ নাই। এই স্থানে বেলুড় মঠের পাণ্ডা আসিয়া খাতায় শ্রীম-র নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইল।

শ্রীম বাহিরে আসিতেছেন ভক্তসঙ্গে। ফটকের ডান হাতের দোকানের সম্মুখে ভূমি হইতে অন্নের কয়েকটি দানা কুড়াইয়া 'মহাপ্রসাদ মহাপ্রসাদ', উচ্চারণ করিয়া অতি শ্রদ্ধায় ভক্ষণ করিলেন। ভক্তগণও তাহাই করিলেন।

শ্রীম মন্দির-অঙ্গন হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। এখন উত্তর দিকে চলিতেছেন। সঙ্গে মুকুন্দ জগবন্ধু বিনয় মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু। পাণ্ডা ও ভিখারীর দল পাছে পাছে যাইতেছে, আর বলিতেছে, বাবু দাও, বাবু দাও। রাস্তার বাম দিকে একটি খঞ্জ বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া শ্রীম ভক্তদের বলিলেন — দাও, দাও, একে দাও।

বিন্দু সরোবরের দক্ষিণ তীর দিয়া শ্রীম চলিয়াছেন পশ্চিম দিকে। সহাস্যে ভক্তদের বলিলেন — বাবা, যে নাম লিখে দিয়েছি — 'শ্রীম',

এতেই খুঁজে বের করবে। আবার বাড়ির ঠিকানা আছে। অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, এ নাম সকলেই জানে। ভুবনেশ্বর মঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করে পুরো নাম জেনে নিবে।

শ্রীম বিনয়কে বলিলেন, একে (গাইড পাণ্ডাকে) এক আনা করে সকলে দাও। পাঁচ আনা হবে। আর তিন আনা আমাদের জন্য দিয়ে আট আনা পুরিয়ে দাও।

শ্রীম রঙ্গরস করিয়া চলিয়াছেন। ভিখারীর দল পিছন লইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, আনি ভাঙ্গিয়ে এদের দিয়ে দাও না। জগবন্ধু বলিলেন, They are paid once twice thrice (এক দুই তিনবার এদের দেওয়া হইয়াছে)। শ্রীম রহস্যচ্ছলে ভিখারীদের বলিলেন, তোমরা ইংরেজী বোঝ — once twice thrice (একবার দু'বার তিনবার)? ভিখারীরা হাসিতেছে।

গাইড্ আট আনায় সন্তুষ্ট নয়। ঘ্যানর ঘ্যানর করিয়া পিছনে চলিতেছে। সে কেবল মন্দির দেখাইয়াছে। শ্রীম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এত লোভ ভাল নয়। (পাণ্ডার প্রতি) যা দিয়েছে তাই ন্যাও। তুমি মঠের পাণ্ডা, তাই এত দেওয়া হোল। অন্য লোক হলে এত দিতে হতো না। সাধুদের সেবা কর তাই এই দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডা বলিল, বাবু না কাঁদলে কি মা দুধ দেয়? তাই মায়ের কাছে বলছি। শ্রীম সহাস্যে বলিলেন — বা, বেশ কথাটি শিখে রেখেছে।

বিন্দু সরোবরের পশ্চিম তীরে মঙ্গলচণ্ডী মন্দির। শ্রীম উহা দর্শন করিলেন। রাস্তার উপর দুই তিনটি নগ্ন বালক অবাক হইয়া শ্রীমকে দেখিতেছে। শ্রীম চলিতে চলিতে একটি মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ রাস্তা? জগবন্ধু বলিলেন, ডান হাতের রাস্তা। শ্রীম বলিলেন, কেন ওটাতে? জগবন্ধু বলিলেন, ঐটে আমাদের রাস্তা নয়। ওটা গেছে বাইরে গ্রামে। আমরা যাব স্টেশনে। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, পূর্ব তীর দিয়ে যে রাস্তায় আসা হয়েছিল, সেটা যদি সোজা হয় তা হলে ওটাতে গেলেই হতো। ভক্তরা বলিলেন, তা হলে এসব দর্শন ও পরিক্রমা হতো না। শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব তীরের রাস্তা কে suggest (ইঙ্গিত) করেছিল? ভক্তগণ বলিলেন, গাড়োয়ান।

তার সোজা হতো ঐ রাস্তা। কিন্তু এ তীরের সব দেখা হতো না। সরোবরের তীরে পাণ্ডাদের বাড়ি। কোন কোন বাড়িতে মুড়কির দোকান। এখানকার মুড়কি প্রসিদ্ধ।

শ্রীম বায়ুকোণে দাঁড়াইয়া সরোবর দেখিতেছেন। এতক্ষণ পশ্চিম তীরের বাড়ি ও মন্দিরাদিতে সরোবর ঢাকা ছিল। সরোবর দেখিয়া শ্রীম বালকের ন্যায় সহজানন্দে বলিয়া উঠিলেন, দেখুন বিন্দু সরোবর! দেখে নিন্! কপালে আর হয় কিনা কে জানে। দেখছি, সবই প্রায় একরকম — পুরী আর এখানকার। ঐ দেখেই এই হয়েছে। জগবন্ধু বলিলেন, সবই প্রায় এক সময়ের বলে বোধ হয়। মনোরঞ্জন বলিলেন, এও আগে হতে পারে, ও পরে। শ্রীম ইহা সমর্থন করিয়া বলিলেন, তাও হতে পারে।

শ্রীম চলিতেছেন। উত্তর তীরে পুলের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, একে বলে দাও বার আনা হলে চলুক। গাড়োয়ান রাজী। শ্রীম গাড়ীতে উঠিলেন। ভক্তগণ পদব্রজে সঙ্গে চলিয়াছেন। একটু অগ্রসর হইলে স্যানাটোরিয়াম হোটেল। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, এখানকার সব সংবাদ জানলে হয়। জগবন্ধু সব সংবাদ জানিয়া আসিয়া বলিলেন, ত্রিশ টাকা মাসে খাওয়া খরচা। রুম নিলে বেশী। সিট্ নিলে এর মধ্যেই। দু'বেলা চা আর তিন বেলা আহার। মাছ বা মাংস রোজ দেয়, ইত্যাদি।

গাড়ী আবার চলিল।

২

গো-শকট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সম্মুখে আসিয়া থামিল। শ্রীম নামিয়া আসিয়া ডিস্‌পেনসারিতে প্রবেশ করিলেন। হল ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তারপর চেয়ারে বসিলেন। ভক্তরাও ক্লান্ত, তাই মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী কহিতেছেন, এদিকে এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ। আর ওদিকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। শ্রীম বলিলেন, ওতে না (ঔষধ) খারাপ হয় বলে। (সহাস্যে) এখানে (মাঝখানে ডান হাতখানি তুলিয়া) অন্ততঃ হাত দিয়ে পার্টিশান দিলেও হয় (সকলের হাস্য)।

ডিস্‌পেনসারী হইতে বাহির হইয়া শ্রীম মঠের ফটকের বড় রাস্তা দিয়া

চলিতেছেন, আর দুই দিকে বাগান দেখিতেছেন। এইবার কূপের কাছে আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলঘর দেখিলেন। সম্মুখে একটি রিকসা গাড়ী পড়িয়া আছে। ডান হাতে গাড়ীটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

একজন ভক্ত (স্বগত) — বাবা, কি শ্রদ্ধা! এই গাড়ী রাখাল-মহারাজ চড়তেন। তাই উহা পবিত্র। এঁরাই দেখছি, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একে অন্যকে জানেন। আর জানেন, ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান, নররূপী। আর এঁরা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ। শাস্ত্রবচন জাগ্রত করতেই এঁদের আগমন — "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু"।

রাখালমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আজীবন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই রাখালমহারাজের প্রতিষ্ঠিত এই মঠ। তিনি প্রথমে শ্যামপুকুর স্কুলে ছিলেন শ্রীম-র প্রিয় ছাত্র, পরে হইলেন শ্রদ্ধেয় গুরুভাই।

শ্রীম হলঘর দিয়া ভিতরের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। মঠের মহন্ত স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী শংকরানন্দ, ভক্ত বিনোদবাবু (পরে সাধু হন), বিপিন জামাই প্রভৃতি সাধু ও ভক্ত প্রায় দশজন আসিয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিলেন। দ্বিতলের ঠাকুরঘর ভোগরাগের পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই শ্রীমকে রান্নাঘরের বারান্দায় প্রথম কামরার পাশে ভক্তসঙ্গে কুশাসনে বসাইলেন। তিনি প্রসাদ পাইবেন। পূর্বে সংবাদ পাইয়া সকল প্রকার প্রসাদ রাখা হইয়াছে।

শালপাতায় অন্ন প্রসাদ পরিবেশন করা হইয়াছে। আর চায়ের প্লেটে পায়েস। শ্রীম-র পাশে বসা স্বামী শংকরানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দ। শ্রীম প্রসাদ খাইতেছেন আর ফষ্টি নষ্টি, রঙ্গরস করিতেছেন। পায়েসের প্লেটটা মুখের কাছে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার এটা তোলা যেমন মেয়েরা নথ তুলে দেখে তেমনি (সকলের বিলম্বিত উচ্চহাস্য)। আনন্দে আহার শেষ হইয়াছে। এইবার কলে হাত ধুইয়া সকলে হল ঘরে বসিয়াছেন। শ্রীম-র আদেশে জগবন্ধু বিনয় ও সুখেন্দু মঠের উপর ও নিচের সবগুলি ঘর দেখিয়া আসিলেন। একটি ঘরে বিপিন জামাই জপ

করিতেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভক্ত স্ত্রী ও পুরুষ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত তাঁহারা পড়েন। আজই প্রথম সেই অমর গ্রন্থের লেখক বেদব্যাসতুল্য শ্রীমকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। নূতন সাধু ও ব্রহ্মচারীগণও সকলে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সানন্দে শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন।

হলঘরে ভুবেনশ্বর ও মন্দিরের সম্বন্ধে নানা কথা চলিতেছে। মন্দির সংস্কারের জন্য প্রত্যেক যাত্রী থেকে দু'পয়সা নেয়, এটা খুব ভাল। সংস্কারের অভাবে কত মন্দির, দেব দেবী ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে। ভক্ত যাত্রীদের সাহায্যে এসব সংস্কার হলে খুব ভাল — শ্রীম বলিলেন। স্বামী শংকরানন্দ বলিলেন, অনেক লোক নাটমন্দির দিয়ে এসে মাথা গলিয়ে ভিতরে চলে যায়। পয়সা দেয় না। ফাঁকি দেয় অমন শুভ কাজে। মনোরঞ্জন বলিলেন, বিনয়মহারাজ আজও দেখেছেন ঐরূপ ফাঁকি দিতে। এইসব লোক penny wise pound foolish (কড়িতে কড়া কাহনে কানা)। এরা বোঝে না দু'পয়সায় কত বড় কাজ হচ্ছে।

গাড়ী ধরিতে হইবে। তাই শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ঠাকুরের অন্যতম সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তীর্থভ্রমণে এখানে আসিয়াছেন। এখন বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সহিত দেখা না করিয়াই শ্রীম অনিচ্ছায় বিদায় লইলেন।

শ্রীম বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। মহন্ত দুইটি উত্তম গোলাপ আনিয়া শ্রীম-র হাতে দিলেন। বলিলেন, এইমাত্র ফুটেছে। স্বামী শংকরানন্দ দুইটি বড় পাকা পেঁপে আনিয়া শ্রীম-র হাতে দিলেন। আর সহাস্যে মহন্তকে বলিলেন — কই, পত্র দিলে না, 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং'? শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিলেন, হাঁ, 'তোয়ং' (জল) পেটে আছে। আর (গোলাপ ফুল ও পেঁপে দেখাইয়া) আর এই 'পুষ্পং' আর এই 'ফলং'। স্বামী শংকরানন্দ সহাস্যে বলিলেন, কিন্তু ওটি বাদে — 'যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।' (গীতা ৯-২৬)

শ্রীম ধীরে ধীরে চলিতেছেন। আশ্রমবাসী সাধু ও ভক্তগণও চলিতেছেন। স্বামী শঙ্করানন্দ বারবার পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতেছেন, মাস্টারমশায়, এই মঠে এসে কিছুদিন বাস করুন। মহারাজের মঠ। তাঁকে

আপনি অত ভালবাসতেন। আমাদের সকলের খুব আনন্দ হবে। শ্রীম উত্তর করিলেন, বুড়োদের কিছুই স্থির নাই। কখন কোথায় তিনি নিয়ে যাবেন তা তিনিই জানেন। তোমাদের মনে আছে স্বামীজীর কথা? বলেছিলেন গদগদ হয়ে, 'এই ক'টা বছর নাকে দড়ি দিয়ে আমায় বাঁদরনাচ নাচিয়েছেন।' বলরাম মন্দিরে আমাকে বলেছিলেন। আবার বাবুরাম মহারাজও এই কথাই বলেছিলেন। একবার রেগে মঠ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। কাঁধে গামছা আর পায়ে চটিজুতা। চটর্ চটর্ করে চলছেন। ও মা, যেই ফটকের কাছে গেলেন, দেখলেন ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একটা দড়ি। দড়িটা ধরে নাকেবাঁধা একটা বাঁদরকে নাচাচ্ছেন। বাবুরাম মহারাজ হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। অত রাগ, কোথায় গেল।

ফটক পার হইতেছেন সকলে। স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, কারুকে পাঠিয়ে দেব, ধরে নিয়ে আসবে গিয়ে। অমন প্রশান্ত ভাব এইখানে। সব মঠ থেকে ভাল। মহারাজ বলতেন, পুরীর হাওয়া আর ভুবনেশ্বরের জল একসঙ্গে হলে বেশ।

বড় রাস্তায় শ্রীম, সাধুগণ ও ভক্তগণ দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী শঙ্করানন্দ বলিলেন, এবার গাড়ীতে উঠুন। শ্রীম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন — সে কি, সাধুদের সামনে গাড়ীতে ওঠা? সাধুগণ তাই প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম ভুলেও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না — এটি বরাবর দেখছি। ঠাকুর তাঁকে লোকশিক্ষার জন্য গৃহস্থ-আশ্রমে রেখেছেন। বড়ঘরের দাসীর মত তিনি গৃহে আছেন — প্রাচীন কালের ঋষিদের মত। সাধুগণ নারায়ণের রূপ, ঠাকুর বলতেন। এই মনে করে তিনি অকাতরে তাদের সম্মান করেন তাদের বয়স বিদ্যা গুণ নির্বিচারে। তাঁর কৃপায় যারা সাধু হয়েছে তাদের প্রতিও এই একই দিব্য আচরণ। বাজনার বোল হাতে আনতে হয়। খালি মুখে বললে কি হয়? ঠাকুরের এই মহাবাক্যের জীবন্ত মূর্তি শ্রীম।

শ্রীম গোযানে চড়িয়া স্টেশনের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিতেছেন, বেশ successful trip (সফল যাত্রা)! মনোরঞ্জন কাপড়ের গাঁটরীতে পেঁপেটি বাঁধিয়া লইলেন।

ভবানীপুরের ভক্ত হরিদাস মিত্র বায়ুপরিবর্তনে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীম-র আগমনবার্তা পাইয়া স্টেশনে আসিয়াছেন। শ্রীমকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে লইয়া স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেলেন। শ্রীম বাহিরে বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে একটি ইজি চেয়ারে বাহিরেই বসান হইল। স্টেশন মাস্টার আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম নিজ মনে হাসিতেছেন। অন্তেবাসীর কানে কানে বলিলেন, দেখলে ঠাকুরকে ডাকলে কত খাতির!

অন্তেবাসী (স্বগত) — আমাকে কেন বললেন, একান্তে এই কথা? মানুষের মনে যশাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বুঝি এই — ঠাকুরের একান্ত শরণাগত হয়ে সংসারে থাকা। এই উপায়ে বুঝি ভুক্তি মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। তাই এই পথ সর্বোৎকৃষ্ট।

ট্রেন আসিল দুইটা পঞ্চান্ন মিনিটে। শ্রীমকে লইয়া ভক্তগণ ট্রেনে আরোহণ করিলেন। হরিদাস মিত্র শ্রীম-র সহিত নিজের কথা কহিতেছেন। স্টেশন মাস্টার ও স্থানীয় ভক্তগণও গাড়ীতে চড়িলেন। তাঁহারা সকলে প্রণাম করিয়া নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িল তিনটায়। স্টেশনের উভয় দিকে বন ও সরকারী রিজার্ভ। চোর দস্যু ও হিংস্র জন্তুর উপদ্রব এখানে বিলক্ষণ।

শশী নিকেতন, পুরী।
২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৪ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রত্যাবর্তন

১

ফুস্‌ফাস্ রবে গাড়ী ছুটিয়াছে খুর্দা জংশনে, কাল ধূমে আকাশ ছাইয়া। শ্রীম বালকের ন্যায় কৌতূহলে উভয় পার্শ্বের বনজঙ্গল, রাখাল ও গরুর পাল দেখিতেছেন — নয়নে আনন্দের উচ্ছ্বাস।

শ্রীম-র পাশে একটি জৈন যুবক বসিয়াছে। শ্রীম তাহার সহিত ফষ্টিনষ্টিচ্ছলে কথা কহিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, ধর্মসম্বন্ধে এই যুবকের কি ধারণা তাহা জানিবেন।

শ্রীম (জৈন যুবকের প্রতি) — অহিংসা পরমো ধর্মঃ, না জী?

যুবক — ওহি তো সব হ্যায়।

শ্রীম — আচ্ছা জী, ইস্‌কা মানে কেয়া হ্যায় — জীবহত্যা না করো, কেবল এহি হ্যায়, কি আউর কুছ হ্যায়?

যুবক — হাঁ জী, এহি প্রধান হ্যায়।

শ্রীম — আচ্ছা জী, সত্যপালন, পবিত্রতা, সংযম, প্রেম, ইয়ে সব ভী ইস্ 'অহিংসা'মে আ যাতে — নহি কেয়া?

যুবক (উত্তর দিতে না পারিয়া) — জীবহত্যা না করনা চাহিয়ে।

যুবকের ধর্মের সাধারণ জ্ঞানমাত্র আছে। ধর্মের আচরণ অর্থে সে বোঝে কেবল জীবহত্যা না করা। সত্যাদি দৈবগুণের সঙ্গে ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক আছে, উহা সে জানে না। শ্রীম জিজ্ঞাসুর আসনে বসিয়া যুবকের বুদ্ধিকে আরও উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অদ্ভুত শিক্ষক! নিজে হারিয়া যাইবার ভান করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেছেন। কথা চলিতেছে।

শ্রীম (যুবকের) প্রতি — আচ্ছা জী, জীবমাত্র হি ঈশ্বরকা নিবাসস্থল হ্যায়, এইসি ভাবনা ক্যায়সা হ্যায়?

যুবক — বহুৎ আচ্ছা হ্যায়।

শ্রীম — ঈশ্বরকো তো সবকো হি শ্রদ্ধা করনা চাহিয়ে?

যুবক — এভী ঠিক হ্যায়।

শ্রীম — আগর, সব জীবমে ঈশ্বর হ্যায়, এইসি বুদ্ধি পাক্কী হো জায়, তো আপনে আপ হি জীবহত্যা নাহি করতা। কেঁও কি ঈশ্বরকা শরীর হ্যায় জীব।

যুবক (বিনীত ভাবে) — হাঁ, জী।

শ্রীম — ঈশ্বরসে প্রেম হো জায় তো জীবমে ভী প্রেম আপ্‌সে হি আপ আ জাতা হ্যায় — কেয়া নাহি জী?

যুবক — বিলকুল জী।

শ্রীম — আভি ঈশ্বরসে প্রেম ক্যায়সা হোতা হ্যায়?

যুবক নিরুত্তর।

শ্রীম — আচ্ছা জী, মনুষ্যকে সাথ হামারা প্রেম ক্যায়সা হোতা হ্যায়?

যুবক — এক সাথ রহনা, খানাপিনা করনা, বিপদাপদমে সহায়তা করনা — ইস্‌সে প্রেম হোতা হ্যায়।

শ্রীম — য্যায়সা হি ঈশ্বরকে সাথ ভী হোতা হ্যায়। ঈশ্বরকি পূজা করনা, উনকা গুণকীর্তন করনা, খিলানা পিলানা, প্যারসে পুকারনা — ইস্ প্রকার কে আচরণসে হি ঈশ্বরমে ধীরে ধীরে প্রেম হো যাতা হ্যায়। জীবহত্যা না করনে কে সাথ, ঈশ্বরমে প্রেম হোনেকে লিয়ে প্রযত্ন ভী করনা চাহিয়ে। কিসিকে উপর বুরী ভাবনা রাখনা, কি কিসিকো ধোখা দেনা, ঝুট বোলনা, এভী হিংসা হ্যায়।

যুবক (অতি সবিনয়ে) — হাঁ, মহারাজ।

যুবক ভাল লোক। কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানে না। এইরূপ গভীর ধর্মব্যাখ্যা মনে হয় আজই সে প্রথম শুনিল। আর সে গোঁড়া জৈন নহে। গোঁড়া জৈনগণ ঈশ্বরকে মানে কেবল আদর্শরূপে — an ideal Being. জীবের কার্যে ঈশ্বরের কোন হাত নাই, না তো জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে। আপন কর্মফলে জীব বদ্ধ হয়, আবার মুক্ত হয়। কর্মই প্রধান!

গাড়ী খুর্দায় থামিল। শ্রীম ও ভক্তগণ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন।

কারণ এই গাড়ী যাইবে ওয়ালটেয়ার। শ্রীম ও ভক্তগণ যাইবেন পুরী। শ্রীম-র নামিবার পূর্বে যুবক যুক্তকরে অতি ভক্তিভরে নতশির হইয়া শ্রীমকে অভিবাদন করিল।

একটি ভক্ত (স্বগত) — মানুষের মনের উপর এরূপ সরস ও সুনিপুণ অস্ত্রোপচার, কেবল অবতারের হাতে গড়া ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যের পক্ষেই সম্ভব। অমানী হয়ে মান দিয়ে লোককে বশীভূত করার শক্তিও কেবল এইরূপ দৈব আচার্যেরই থাকে। অযাচিত প্রেমমন্ত্রের স্পর্শে কি অমূল্য ধনই লাভ করল! ধন্য যুবক, ধন্য আচার্য! যুবকের মনকুসুমটি সূর্যকিরণে কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। যুবকের জীবনগতি পরিবর্তিত হল। 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা'* — ভগবান শঙ্করাচার্যের এই মহাবাক্য আজ মূর্ত হল।

ভক্তগণ খুর্দায় রাজেনবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। শ্রীম থার্ডক্লাস যাত্রীর প্রতীক্ষালয়ের সম্মুখের ফুলবাগিচার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজেন আসিয়া প্রণাম করিয়া শ্রীম-র সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি রেলকর্মচারী। তাঁহার পত্নী অসুস্থা থাকেন বার মাস। আফিসের কর্ম, আবার বাড়ির সকল কর্ম তাঁহাকে করিতে হয়। তাই বড় দুঃখী, বড়ই অশান্তি গৃহে। শ্রীম-র নিকট দুঃখ নিবেদন করিতেছেন। আর শ্রীম মায়ের মত সমবেদনায় কাতর হইয়া সব শুনিতেছেন।

রাজেন হঠাৎ চঞ্চল হইলেন, শ্রীম-র সেবার জন্য কিছুই আনেন নাই, ইহা স্মরণ করিয়া। শ্রীম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। তিনি রাজেনকে দুঃখনিবারণের উপায় বলিয়া দিতে লাগিলেন।

শ্রীম (রাজেনবাবুর প্রতি) — ঠাকুর তাই ভক্তদের এই সংসাররূপ জ্বলন্ত অনলের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় বলে দিয়ে গেছেন। বলেছিলেন, সংসারে থাকলে মেঘ উঠবেই। ভয় পেয়ো না। মেঘ আবার চলে যাবে।

বলেছিলেন, বড়ঘরের ঝিয়ের মত থাকবে সংসারে। ঝি সব কাজ মন দিয়ে করে যেন আপনার কাজ, আপনার বাড়ি। কিন্তু, অন্তরে জানে

---

*সজ্জনের ক্ষণকালের সঙ্গ-ও ভবসাগর পার করার নৌকা স্বরূপ।

এটা তার ঘর নয়! তার ঘর গ্রামে। সেখানে তার ছেলেপুলে থাকে। তেমনি সব করে যাওয়া যা আসে কর্তব্য বলে। অন্তরে কেঁদে কেঁদে বলা — প্রভো, শক্তি দাও, সুমতি দাও। তোমায় চিন্তা করার সুযোগ দাও। আর বলতে হয় ভুলিও না প্রভো, ভুলিও না। তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমায় ভুলিও না।

বড় কঠিন স্থান সংসার! অযুত হস্তীর বল বুকে নিয়ে ভক্তরা সংসার করে। দুটি তরোয়াল ভক্তদের ঘোরাতে হয় — একটি কর্মের, অপরটি জ্ঞানের।

যতটা পারেন করে যান তাঁর কাজ বলে। আর প্রার্থনা করবেন — বাপ, কমিয়ে দাও কাজকর্ম। তোমায় চিন্তা করার সুযোগ সুবিধে করে দাও।

ঈশ্বর যে আপনার বাপ, আপনার মা। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য সব করেন। বাপ-মা কিছু খারাপ করতে পারেন না, এই বিশ্বাস রাখতে হয়। যখন অসহ্য হয় তখন নির্জনে গোপনে খানিকক্ষণ কাঁদা। তাহলে হৃদয়ের ভার হাল্‌কা হয়ে যায়। তখন তিনি মনের অতি নিকটে এসে যান।

সুষুপ্তিতে তাঁর নিকটে এসে যায় জীব। আর বিপদে পড়ে কাঁদলেও জাগ্রতাবস্থায়ই জীব তাঁর নিকটে এসে যায়। এই দু’টি ব্যবস্থা তাঁর জগৎরক্ষার বিচিত্র উপায় — সুষুপ্তি আর ক্রন্দন। নিরানন্দময় সংসারে তিনি ভক্তদের রক্ষা করেন এই সাময়িক আনন্দ দিয়ে, শান্তি দিয়ে। ক্রমে ভক্তগণ তাঁর হাত দেখতে পায়। তখন অত বিচলিত হয় না শত বিপদেও।

ঠাকুরের আগমনই আমাদের জন্য, আপনাদের জন্য। তিনি জানতেন, ভক্তদের এই সব বিপদ হবে। তাই আগে থেকেই উইল করে রেখে গেছেন রক্ষামন্ত্র — যেমন বাপ-মা রেখে যায় নাবালক ছেলের জন্যে।

ঠাকুর বলেছিলেন — মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য — জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি। আর সাধুসঙ্গটি রাখবেন।

ভক্তরা মুড়ি ও কলা কিনিয়া খাইলেন খুর্দায়।

এখন অপরাহ্ন সাড়ে চারিটা। গাড়ী ছাড়ার সময় হইয়াছে। রাজেন শ্রীমকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণও শ্রীম-র দুই পাশে বসিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার উপর ভীড় না আসে। কক্ষটিতে তিন সারি লম্বা বেঞ্চ

পাতা আছে। গাড়ী চলিতেছে পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে। শ্রীম-র জন্য কম্বল পাতিয়া দিয়াছেন ভক্তগণ দক্ষিণের সারির প্রথম বেঞ্চে। শ্রীম পূর্বের ন্যায় বালকবৎ আনন্দচঞ্চল। কখনও বাহিরের বাগান, ফসলের জমি দেখিতেছেন। কখনও ভিতরের যাত্রীদের দেখিতেছেন। আনন্দে বলিলেন, পটপরিবর্তন বলে না ওরা (থিয়েটারওয়ালারা)? মনোরঞ্জন বলিলেন, এ যে গাড়ী পরিবর্তন (সকলের উচ্চহাস্য)! শ্রীম কৌতুকানন্দে ঐ উচ্চ হাসির সহিত স্বীয় প্রাণখোলা উন্মুক্ত হাস্যে বলিলেন — ও বাবা, এ যে একেবারে গাড়ী পরিবর্তন!

২

বেঞ্চের দক্ষিণ সারির পূর্বধারে একটি লোক বসা! বেশ অনেকটা সাধুর মত। তাঁহার সম্মুখে একটি সেতার পড়িয়া আছে বেঞ্চের উপর। শ্রীম-র লক্ষ্য ঐ দিকে। একটু পর কম্বলখানা হাতে লইয়া — 'যাই, ওখানে সাধুর কাছে বসা যাবে' — বলিয়া শ্রীম সাধুর কাছে গিয়া বসিলেন। ভক্তরাও উঠিয়া সেখানে গেলেন — মুকুন্দ, বিনয়, জগবন্ধু, সুখেন্দু ও মনোরঞ্জন। শ্রীম সাধুর সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছেন কম্বলাসনে। শ্রীম প্রণাম করিবার পূর্বেই সাধু শ্রীমকে প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। ইনি শংকর সম্প্রদায়ের সাধু, 'গিরি'-নামা। সাধু হইবার অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা শ্রীমকে বলিতেছেন। বয়স পঞ্চাশ।

এক সময়ে পরিবারে আট নয় জন লোক পরপর মরিয়া যায় প্লেগে ও নিউমোনিয়ায়। ঘরে কেহ জীবিত ছিল না। তাই সংসার অনিত্য বোধ হওয়ায় সাধু হইয়াছেন। জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশ, নাগপুর। এখন সব সামলাইয়াছেন। সংসার অনিত্যবোধে সংসার ছাড়িয়াছেন। এখন ঈশ্বর সত্য, এই বোধ প্রায় প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীম-র ইচ্ছা সাধুর গান শুনেন। সেতার পড়িয়া আছে দেখিয়া শ্রীম মনে করিয়াছেন সাধু গান জানেন। কিন্তু পরে জানা গেল উনি গান জানেন না। তাই গাহিতে অনুরোধ করিলেও গান গাহিলেন না। স্পষ্ট করিয়া বলিলেনও না যে জানেন না। শ্রীম যে কোনও রকমে সাধুর চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে চান। উহা হয় গানে। যাহার ভিতর যে

কোন ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, উহা সহজে প্রকাশ পায় সঙ্গীতে।

অগত্যা শ্রীম অনুরোধ করিলেন, ভগবানকে বিষয়মে কৃপয়া দো চার বাণী শুনাইয়ে। আপলোগ মহাত্মা হ্যায়। মহাত্মাসে ভগবানকি বাণী সুন্‌নী চাহিয়ে। সাধু প্রচ্ছন্ন দীনতায় উত্তর করিলেন, খাস্ মহাত্মা কাঁহা? বহুৎ বিরলা হ্যায়। দো খাস্ মহাত্মা খণ্ডগিরিমে নিবাস করতে হ্যাঁয়। কভি কভি উন্‌কা দর্শন হোতা হ্যায়।

শ্রীম আরও দুইবার গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গাহিলেন না। অগত্যা শ্রীম নিজেই ইমনকল্যাণ রাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীম (সহাস্যে) বলিলেন, হয়? সাধু উত্তর করিলেন, প্রেম্‌সে যো কিয়া জাতা হ্যায় সো হি আচ্ছা হোতা হ্যায়। হোগা নাহি কেঁও?

ভুবনেশ্বর ও খুর্দার মধ্যপথে মনোরঞ্জন ও একটি যুবক জৈন সাধুটির সম্বন্ধে সমালোচনা করিতেছিলেন। এখন এই সাধুটির সম্বন্ধেও কথা হইতেছে। একজন ভক্ত বলিলেন, যে রকমই হোক, সাধুর গান গাওয়া উচিত ছিল। বৃদ্ধ লোক বলছেন মনে করেও গাইতে পারতো। শোকতাপে হৃদয় শুষ্ক হয়ে গেছে।

শ্রীম সাধুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেঁও জী, আপলোগ গীতা উপনিষদ্ পঢ় লিয়া হোগা? সাধু বলিল, হাঁ জী, কুছ পঢ়া হ্যায়। শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কঠোপনিষদ্? সাধু উত্তর করিল, না জী পঢ়া নাহি হ্যায়। শ্রীম মুকুন্দের কানে কানে বলিলেন, গান আমরা গাইলুম কেন? ধরিয়ে দেবার জন্য। বোঝা যাচ্ছে তেমন জানা নাই।

শ্রীম (মুকুন্দের প্রতি, লক্ষ্য সাধু) — একবছর হয় ঠাকুরের শরীর গেছে, এইটিন্ এইটিসেভেনে (১৮৮৭ খ্রীঃ)। কাশীতে একজন খুব বড় গাইয়ে ছিলেন। নাম মহেশ বীণকার। তিনি অতি উত্তম বীণা বাজাতে পারতেন। তিনি ইতিপূর্বে ঠাকুরকে ঐ বীণায় আশোয়ারী রাগিণী শুনিয়েছিলেন। আমাদের ইচ্ছা ঐ রাগিণী শোনা, বা অন্য কিছু। তিনদিন ঘুরে ঘুরে ফোরথ্ ডে-তে (চতুর্থ দিনে) ধরে পড়লুম বাজাতেই হবে। তারপর বাজালেন কানাড়। আহা, কি বাজনা, এখনও কানে লেগে রয়েছে! তিনি পরে সাধু হয়ে গিছলেন। শেষে দেহত্যাগ করলেন। প্রয়োপবেশন করে শরীর ছাড়লেন। এই জ্ঞান হয়েছিল, দেহ তো থাকবে

না — অবশ্য যাবে। তবে এর সেবা করা কেন আর? এই সংকল্প নিয়ে একটি বাগানে, কুটীরে বসে প্রাণত্যাগ করলেন। কি আশ্চর্য!

ভক্তদের কাছে গান গাইলে আনন্দ হয়। অন্য লোকের তা ভাল লাগে না। গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে যেমন আনন্দ করে, এ-ও তেমনি। (সাধুর প্রতি) ক্যা জী, গাঁজাখোর হ্যায় নাহি? গাঁজাখোর গাঁজাখোরকো দেখনেসে আনন্দ করতে হ্যায় নাহি জী?

গাড়ী দেলাং স্টেশনের প্রায় কাছে আসিয়াছে। একটি বালক গাড়ীর দরজা খুলিয়া মেঝেতে বসিয়াছে। তাহার পা ফুটবোর্ডে রাখিয়াছে। পড়িয়া যাইবে ভয়ে মুকুন্দ উহা দেখিয়া আর্তনাদের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ও উড়ে' বলিয়া। শ্রীমও 'হা, হা' করিয়া উঠিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখলে, মহামায়া কি করে ভুলিয়ে দেয়। আত্মরক্ষা করা পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। তাইতো ঠাকুর জীবকে শিখিয়েছিলেন, কি করে প্রার্থনা করতে হয় সর্বদা, দিবানিশি। বলেছিলেন, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।

মা-ই বুদ্ধির চালক কিনা! মায়ের দু'টি ডিপার্টমেন্ট আছে — বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া। এই যে এ ছেলেটির আত্মরক্ষার বুদ্ধিও হরণ করেছেন, এটাও অবিদ্যামায়ার কাজ।

তিনি সর্বদা সত্যকে মিথ্যা, শ্রেয়কে প্রেয় বলে বুঝিয়ে দেন। তাই তাঁর অপর রূপকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, বিদ্যামায়াকে। বিদ্যামায়া প্রসন্ন হলে তবে ঈশ্বরের পথে যাওয়া যায়।

গাড়ী চলিতেছে। শ্রীম সাক্ষীগোপালের মন্দির দর্শন ও যুক্ত করে প্রণাম করিতেছেন। সাক্ষীগোপাল স্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। শ্রীম ক্লান্ত। তাই অন্তেবাসীকে বলিলেন, একটু রজঃ হলে হয়। অন্তেবাসী নামিয়া একটু রজঃ আনিয়া শ্রীম-র হাতে দিলেন। শ্রীম পায়ের জুতা ছাড়িয়া 'জয় সাক্ষীগোপাল, জয় ভগবান' বলিয়া সেই রজঃ যুক্ত করে মস্তকে ধারণ করিলেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই সাক্ষীগোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ হলো। অসমর্থ হলে এরূপ করলেও তাঁরই পূজা করা হয়। আর এখানে শত শত ভক্তের চরণরেণু। তাই এই রজঃ জীবন্ত। এসব সঙ্কেত ঠাকুর শিখিয়েছিলেন।

তাঁর একটু প্রসাদী নির্মাল্য, কি চরণরেণু স্পর্শ করলেও তাঁকে স্পর্শ করা হলো। তিনি তো বাইরের কিছু চান না। চান, কেবল মনটি। মনেতে যাঁর সর্বদা তিনি বিরাজমান তাঁর পক্ষে এসবের দরকার নাই। তবুও লোকশিক্ষার জন্য মহাপুরুষগণ এসব বাহ্য আচরণ করে থাকেন।

যদি বল, সকলেরই মনে তো তিনি বিদ্যমান। তার উত্তর — হাঁ, তিনি সকলের মনেই বিদ্যমান। কারণ মনের চালক কিনা তিনি — 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া' (গীতা ১৮-৬১)। কিন্তু কেহ ইহা প্রত্যক্ষ করেছেন, কেহ বা পরোক্ষভাবে বুঝেছেন, বোধে বোধ করেছেন — ঈশ্বর মনের চালক। তাঁদেরই বলে জ্ঞানী। আর কেহ হয়তো এই কথা শুনেছেন শাস্ত্র ও গুরুমুখে, কিন্তু বোধ নাই। আবার কেহ হয়তো আদপেই শুনে নাই। এই তফাৎ, এই বিশেষ।

গাড়ী সাক্ষীগোপাল ছাড়িয়া মালতীপুর স্টেশনের দিকে চলিয়াছে, নারিকেলের বাগানের ভিতর দিয়া ও ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশ দিয়া। শ্রীম-র মন অন্তর্মুখীন, কি ভাবিতেছেন। কোন ভক্ত অনুমান করিলেন তিনি বিষয়ান্তরে চিন্তা করিতেছেন। অস্তগামী সূর্যের কিরণ শ্রীম-র মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। মনোরঞ্জন তাই একখানা চাদর টাঙ্গাইয়া দিলেন।

৩

শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন, ক্রাইস্টের কথা। এখন খ্রীস্ট-জন্মোৎসব চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি আশ্চর্য, এ কেন হলো? ক্রাইস্ট জানতেন, তাঁর ভক্তদের মধ্যে একজন betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে। বেথানিতে (Bethany) ছিলেন তখন Simon the leper-এর (মহাব্যাধিগ্রস্ত সাইমনের) বাড়িতে। এই স্থান জেরুজালেমের দুই তিন মাইলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি শহর।

এক ভক্তের বাড়িতে 'পাসওভার' (Passover) ভোজে সকলে বসেছে তখন বলেছিলেন এই কথা। বলেছিলেন, 'Verily I say unto you, one of you which eateth with me shall betray me.. তোমাদেরই একজন আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আর সে

এখানে আমার সহিত ভোজন করছে। কিন্তু তবুও কিছু বললেন না। জুডাস্ ইসকেরিয়ট (Judas Iscariot) betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করেছিলেন কিনা। দ্বাদশজন অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী পার্ষদগণের তিনি অন্যতম। সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। একসঙ্গে নিবাস, পানাহার, সব করতেন। তবুও কেন এরূপ হলো?

হয়তো লোকশিক্ষার জন্য তাঁরই ইচ্ছাতে এ লীলা। লোভ কত বড় শত্রু, এটি দেখাবার জন্য এই লীলা। মাত্র ত্রিশটি মুদ্রার জন্য এ কাজ করলেন, betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করলেন। জুডাস্ কি আর খারাপ লোক ছিলেন, তা নয়।

গীতায় তাই, কাম ক্রোধ লোভকে নরকের দ্বার বলেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই তিনটিই একসঙ্গে চলে।

মনের চক্রটি জুডাসের ঘুরিয়ে দিলেন। এটি অবিদ্যার কাজ। বাইবেলে একে বলে Satan, শয়তান। 'Satan enters his heart' — শয়তান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলো।

আর একটি দুর্বলতা, সেটি ক্রাইস্ট নিজেই দেখালেন। সেটি দেহবুদ্ধি। তাঁকে ধরবার আগে সাইমন পিটার, আর জেমস্ ও জনকে নিয়ে একান্তে চলে গেলেন। তাঁরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখছেন সব। তিনি একটু এগিয়ে মাটিতে পড়ে প্রার্থনা করছেন, 'Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me.' বললেন, পিতঃ, আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। এই বিপদটি সরিয়ে নিন। ‘This cup' (এই বিপদ), অর্থাৎ crucifiction (ক্রুশে মৃত্যু)। ক্ষণকাল ছিল এই মানুষের ন্যায় দুর্বলতা। মৃত্যুভয়ে ঘেমে অস্থির। চোলা ভিজে গিছলো। একটুপরই আবার rally (মনকে স্থির) করলেন। বললেন, 'Not what I will, but what Thou will.' (না, না আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক)। আবার নিজেই এই দুর্বলতার কৈফিয়ৎ দিলেন। বললেন, The spirit truly is ready, but the flesh is weak' (মন সত্যই প্রস্তুত, কিন্তু দেহ দুর্বল)।

আর একটি শিক্ষা দিলেন ভক্তাগ্রণী সাইমন পিটারকে (Simon Peter) দিয়ে। অতবড় ভক্ত পিটার! পিটার মানে প্রস্তর, বিশ্বাসের

পাহাড়। এটা ছিল তাঁর উপাধি। ক্রাইস্ট এই নামে তাঁকে ডাকতেন। এই সাইমনের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'On this rock I will build my church.' বিশ্বাসের এই শৈলোপরি আমার ধর্মসৌধ রচনা করবো। আর হয়েছিলও তাই। ক্রাইস্টের অন্তর্ধানের পর পিটারই উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে সব গুরুভাই-বোনদের একত্রে রেখেছিলেন। তাঁর 'Flock'-এর (সঙ্ঘের) ভার পিটারের উপরই দিয়ে গিছলেন ক্রাইস্ট।

পিটার বলেছিলেন, আমি আমরণ তোমার সঙ্গে থাকবো। ক্রাইস্ট শুনে বলেছিলেন, আজ রাত্রি দুই প্রহরের ভিতর তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে — 'Before the cock crows twice, thou shall deny me thrice' হয়েছিলও তাই।

ক্রাইস্টকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পিটারও দূরে থেকে পিছু পিছু যাচ্ছেন। গায়ে একখানা চাদর। চাদরটা ধরে কতকগুলি লোক বললে, তুমিও তো তাঁর সঙ্গী। অমনি চাদর ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে দৌড়। খালি গা, শীতকাল। প্রধান পুরোহিতের বাড়িতে বসে আগুন পোয়াচ্ছেন পিটার। দু'বার দু'জন পরিচারিকা স্ত্রীলোক বললে, তুমিও তো ক্রাইস্টের লোক। পিটার অস্বীকার করে বললেন, কার কথা বলছো তোমরা? সত্যি বলছি, আমি তাকে জানি না — 'I know not this man of whom ye speak.' ইতিমধ্যেই মুরগী দ্বিতীয় প্রহরের ডাক ডাকতে লাগলো। পিটার তখন মুরগীর ডাক শুনে ক্রাইস্টের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন।

এ ঘটনাটি দিয়ে ক্রাইস্ট এই শিক্ষা দিলেন — হাজার মহাপুরুষ হও, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে সত্যরক্ষা হয় না। তিনিই কাউকে কাউকে দিয়ে সত্যরক্ষা করান। আর একটি শিক্ষা ঐ — ক্রাইস্ট নিজে যেটি দেখালেন — জীবের দেহবুদ্ধি যেতে চায় না। অর্থাৎ, দেহ ধারণ করলে ভগবানও তাঁর মায়ার অধীন। তাই ঠাকুর বলতেন, সব তাঁর 'অণ্ডারে'। আর 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' সাধারণ জীবের কথা কি — দুর্বল, অতি দুর্বল জীব — 'a broken reed' (একটি ভগ্ন নলখাগড়া)। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা হলে এই দুর্বল জীবনই দুর্জয় হয়।

শ্রীম নীরব। নিবিড় কাল মেঘের ন্যায় ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে পুরীর দিকে। কখন নারিকেল বাগান, কখনও আম্র ও কদলীর

কুঞ্জ, কখনও বা বেণুবনের ভিতর দিয়া গাড়ী তীব্র বেগে চলিতেছে ভক্তগণকে জগন্নাথদর্শন করাইতে। দূরে এক একটি অনুচ্চ পাহাড়ও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

ভক্তগণ একমনে শ্রীম-র কথামৃতপানে মত্ত। বাহিরের জগৎ বুঝি তাঁহাদের ভুল হইয়া গিয়াছে। নিজেদের ভিতর দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন, কি অসহায় অবস্থা মানুষের! গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, অবতার ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদেরই যদি এই অবস্থা, তবে আমাদের 'কা কথা'। এক একবার মনে ভরসাও আসিতেছে। মনে করিতেছেন, আমরা অবতারের পার্ষদদের সঙ্গে রয়েছি, তাঁরা আমাদের ভালবেসেছেন সব দুর্বলতা জেনেও। কি আর করবো? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শরণ। তাঁর পার্ষদগণ আমাদের শরণ। মনের ভিতর চলিতেছে বিচার ও বিশ্বাসের সংঘর্ষ — কখনও ভাবনা, কখনও ভরসা, আর প্রার্থনা।

শ্রীম পুনরায় তাঁহার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তগণের প্রতি) — ক্রুসিফিকশান হবে, তা-ও তিনি জানতেন। কয়েকবারই ভক্তদের বলেছিলেন, 'My time is at hand' (মৃত্যু নিকট)। আহা, কতবার বলেছেন, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে — 'One of you shall betray me'! এই কথা শুনে ভক্তগণ বলতে লাগলেন — প্রভো, সে ব্যক্তি আমি কি? 'Is it I'? তিনি উত্তর করলেন, আমার সহিত যে একসঙ্গে খাচ্ছে সে — 'One of you which eateth with me shall betrary me.' আহা, অত জেনে শুনেও কিন্তু কিছু বলেন নাই জুডাস্‌কে। কি আশ্চর্য তাঁর সহনশীলতা, কি অদ্ভুত শরণাগতি, কি অমানুষিক করুণা, কি অসীম প্রেম!

সকলের সঙ্গে যখন জুডাসও বললেন, আমি কি? 'Master is it I', তিনি তখন প্রশান্ত করুণ দৃষ্টিতে উত্তর করলেন, ঠিক বলেছ — 'Thou hast said.'

মানুষের এই উদার দোষত্রুটিহীন দৃষ্টি কোথায়? একটু পরই যে প্রাণহরণের সহায়তা করবে তার সঙ্গে এই ব্যবহার। একেই বলে সমদৃষ্টি।

ক্রাইস্ট দেখছেন, ঈশ্বরই জুডাসরূপ ধারণ করে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করাবেন। তাই সব সহ্য করলেন অম্লান বদনে। আবার প্রশান্তভাবে

জুডাসের ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা বলে গেলেন। বললেন, যে আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার কি দুর্দ্দশা! তার জন্ম না হলেই ভাল হতো। বলেছিলেন 'Woe to that man by whom the Son of man is betrayed'. বললেন, 'Good were it for that man if he had never be born.'

'Woe to him' মানে, কি দুর্ভাগ্য তার, কি সর্বনাশ! এতে অভিশাপ নাই। মাত্র ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার কথা বলে গেলেন। জুডাস্ পরে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন। আর জগতে অনন্তকাল জুডাসের দুর্নাম রয়ে গেল।

শ্রীম-র মুখে এসব কথা অতি গুরুগম্ভীররূপে প্রতিভাত হইল ভক্তগণের হৃদয়দর্পণে। সকলেই নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় অনুভব করিতে লাগিলেন। তাই তাঁহারা ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, প্রভো সুমতি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না — 'And lead us not into temptation, but deliver us from evil.'

সেতারী সাধু শ্রীমকে গান শুনাইলেন না বটে, কিন্তু শ্রীম-র কথামৃত অতি সশ্রদ্ধভাবে শুনিতেছিলেন। তিনি বাংলা বুঝেন বলিয়া প্রতীত হইল।

গাড়ী মালতীপুর স্টেশনে অল্পক্ষণ দাঁড়াইল। পুনরায় চলিল। বাঁক ফিরিয়া গাড়ী লক্ষ্মীজলার পাশ দিয়া যাইতেছে। শ্রীম লক্ষ্মীজলা দর্শন করিতেছেন। আর দর্শন করিতেছেন জগন্নাথের মন্দিরশীর্ষ। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — জলের মাঝে ঐগুলো কি সব ভেসে রয়েছে? খড়কুটো কি?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে না। ঐগুলি জমির আইল।

শ্রীম (অন্তর্মুখীনভাবে) — কখন কি ভাব হয় বলা যায় না। ত্রিশ বছর আগে গাড়ীতে বসে মন্দির দেখে কেঁদেছিলাম। ‘জগন্নাথ, তোমায় ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে’ — এই বলে। এখন কিন্তু আর ঐ ভাব নাই।

একটি ভক্ত (স্বগত) — কি আশ্চর্য, তিন বছর পূর্বে আমারও এরূপ কান্না এসেছিল মন্দির দেখে এই বলেই — আপনারজনকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে!

সেতারী সাধু সব শুনিতেছিলেন। এবার কথা কহিলেন।

সাধু (শ্রীম-র প্রতি) — মনুষ্য যব সাধন অবস্থামে রহতে হ্যায় তব তক্ প্রেম বড়া প্রবল হোতা হ্যায়। আউর তত্ত্বজ্ঞান হোনেকে পশ্চাৎ য়্যায়সা ভাব নাহি রহতা। আভী আপকা তত্ত্বজ্ঞান হো গিয়া হ্যায়।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — ঠিক ঠিক।

পুরী স্টেশন। যাত্রীগণ সব নামিতেছে। চারিদিকে হৈ চৈ, দৌড়াদৌড়ি। পাণ্ডারা রেলিং-এর বাহিরে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছে, 'বাবু ইয়ারে আস।' ঠেলাগাড়ী ও ঘোড়াগাড়ীওয়ালা চীৎকার করিতেছে — 'বাবু আসন্তু, বসন্তু'। সকলেই ব্যস্ত নিজের নিজের স্বার্থ নিয়া।

শ্রীম এইসব তাজ্জব কাণ্ড বালকের মত আনন্দে দেখিতেছেন। নিকেলের চশমাটি চক্ষুতে সংযোগ করিয়া এক একবার দূরের দৃশ্যাবলীও দর্শন করিতেছেন।

ভগবানের দর্শন হইবে, তাঁহার চরণতলে আমরা আসিয়াছি — এই ভাবনায় যাত্রীগণও উৎফুল্ল। এখানকার বাতাবরণ এই দিব্যভাবে প্রভাবিত? শ্রীম গোলমালের মধ্যে এই সরস উৎফুল্ল 'মাল'টি আনন্দে উপভোগ করিতেছেন। যাত্রীগণের হৃদয়ের আনন্দটি সম্ভোগ করিতেছেন হৃদয়ে। তাই তাঁহার মুখমণ্ডলে এই নির্মল আনন্দের ছটা প্রতিফলিত।

স্টেশনঘরের পাশের বাহিরের ফটক দিয়া শ্রীম বাহির হইলেন। প্যারাডাইস্ হোটেলের সত্বাধিকারী বাঙ্গালীবাবুও এই গাড়ীতে আসিয়াছেন। শ্রীমকে দেখিয়া তিনি দৌড়িয়া আসিলেন ও প্রণাম করিয়া তাঁহাকে নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। শ্রীম বলিলেন, বালতিটা দাও। আর একটা পেঁপেও দাও। বেশ নিয়ে যেতে পারবো। সুখেন্দু সর্বাগ্রে চলিয়া গিয়াছেন আহারের ব্যবস্থার জন্য। জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, বিনয় ও মুকুন্দ সকলে একসঙ্গে চলিয়াছেন কলেজিয়েট স্কুলের পাশ দিয়া। বড় রাস্তায় স্বামী সিদ্ধানন্দ বলিলেন, আজ জগন্নাথের রাজবেশ। দর্শন করে এলাম।

শ্রীম শশীনকেতনের বারান্দায় বসিয়া আছেন, ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ভক্তগণ আসিলেন সাড়ে পাঁচটায়। শ্রীম হাস্যমুখে বলিলেন, A good day's work – আজের দিন সফল।

শশী নিকেতন, পুরী।
২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৪ই পৌষ ১৩৩২ সাল। মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

ষোড়শ অধ্যায়

জগন্নাথের রাজবেশ

১

সিংহদ্বার। শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে অরুণস্তম্ভ। শ্রীম-র পরণে থান কাপড়। গায়ে এ্যাশ কালারের ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী। মাথায় ধুসর রঙ্গের গরম কম্ফোর্টার। দুই স্কন্ধের উপর ভাঁজ করা মটকার চাদর। সঙ্গে বিনয়, জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন — শ্রীম পশ্চাতে। এখন সন্ধ্যা সওয়া ছয়টা। কিছুক্ষণ পূর্বে শ্রীম ভুবনেশ্বর হইতে ফিরিয়াছেন। আজ জগন্নাথের রাজবেশ। উহা দর্শন করিবেন। তাই শশীনিকেতন হইতে শীঘ্র আসিয়াছেন। মুচিশাহি ও দোলমণ্ডবশাহি অতিক্রম করিয়া মন্দিরের পূর্ব দিকে মিষ্টান্নের দোকানে জুতা রাখিয়া আসিয়াছেন। নিজের জুতা শ্রীম নিজহস্তে রাখিয়াছেন, ভক্তদের দেন নাই। বিনয় লাঠিখানা হাত হইতে লইয়া শ্রীম-র হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন। শুদ্ধহস্তে সিংহদ্বারে আসিয়াছেন।

সিংহদ্বারে খুব ভীড়। অসংখ্য লোক আসিতেছে যাইতেছে। শ্রীম মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নত হইয়া দ্বারদেশ ডান হাতে স্পর্শ করিয়া সেই হাত নিজের কপালে ও মস্তকে স্থাপন করিলেন। ত্বরিত পদে চলিতেছেন। দেরী হইয়া গিয়াছে। দর্শন হয় কিনা সন্দেহ। পূর্বমুখী ফটকের প্রবেশপথের দুই দিকে পাথরের দুইটি উচ্চ বেদী আছে। উত্তর দিকের বেদীর পূর্ব দিক হইতে দেড় হাত পশ্চিমে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ মন্দিরে যাইবার পথে এই স্থানে প্রণাম করিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণে যাইবার পথে প্রশস্ত অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি রহিয়াছে। ছয়টি সিঁড়ি উঠিয়া বাম হাতে দক্ষিণ দিকে শিবমন্দির। শিবের সম্মুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া বাহির হইতে যুক্ত করে সদাশিবকে প্রণাম করিলেন। যেন তাঁহার অনুমতি লইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছেন। একে জগন্নাথক্ষেত্র, তাহাতে আবার ভারতীয় একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম

বিমলাদেবী এখানে রহিয়াছেন। শিব এখানে তাই ভৈরবের কাজ করিতেছেন দ্বারপালরূপে। তাই মহাপুরুষ শ্রীম শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন।

শ্রীম অবশিষ্ট প্রস্তরের দ্বাদশটি সোপান আরোহণ করিতেছেন মধ্যস্থল দিয়া। বৃদ্ধ শরীর, আবার অদ্যকার ভুবনেশ্বর দর্শনের ক্লান্তি। অতি ধীরে সোপান অতিক্রম করিতেছেন। ক্লান্ত হইয়া পড়ায় শেষ সোপানের উত্তর প্রান্তে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম-র সম্মুখে মন্দিরাঙ্গনের প্রবেশপথ। আবার চলিলেন। উত্তর দিক হইতে দেড় হস্ত দক্ষিণে ডান হাতে ফটক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। দ্বিতীয় ফটকের ভিতরে নানা প্রকারের প্রসাদী মিষ্টান্নের দোকান। অঙ্গনে ও বাম হাতে টাটকা মুড়কি প্রভৃতি মিষ্টান্ন লইয়া বসিয়াছে। ভক্তরা ক্রয় করে এই সদ্যনিবেদিত মহাপ্রসাদ। শ্রীম আনন্দে উহা দর্শন করিতেছেন আর অগ্রসর হইতেছেন ধীরপদে। সত্রভোগ মন্দিরের পূর্ব দিকে দাঁড়াইয়া শ্রীম উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ যাত্রী, গৃহ, বিপণি ও দ্রব্যাদি দর্শন করিতেছেন। এইবার দক্ষিণ দিকে রওনা হইলেন। শ্রীম-র দক্ষিণ হাতে সত্রভোগ মন্দির। আর বাম হাতে জগন্নাথের রন্ধনশালার প্রবেশপথ। এই পথের একটু উত্তরে ক্ষেত্রবাসী একজন বৃদ্ধ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় তিনি রাজবেশ দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। দর্শন হয় কিনা সন্দেহ। তাই ডাক্তার বলিলেন, যান দেখুন। শ্রীম ব্যাকুল হইয়া চলিলেন।

নাটমন্দিরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া শ্রীম দেখিলেন দরজা বন্ধ। তাই নাটমন্দিরে না উঠিয়া শয়নমন্দিরের দক্ষিণ দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব দিক দিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিতেছেন। শ্রীম-র বাম হাতে একটি মন্দির আর ডান হাতে খাজাঞ্চির ঘর। শ্রীম উপরের সিঁড়ির পূর্ব প্রান্তস্থ সিঁড়িটি ডান হাতে স্পর্শ ও প্রণাম করিয়া দরজার পূর্ব দিক দিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এখন পূর্ব দিকের একটি পিলারের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি যুক্ত করে প্রণাম ও দর্শন করিতেছেন। জগবন্ধু, বিনয় ও মনোরঞ্জন শ্রীমকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন যাহাতে ধাক্কা না লাগে। বড় ভীড়। শ্রীম-র পশ্চাতে একদল মধ্যভারতীয় মহিলা।

আজ রাজবেশ। তাই বলরাম সুভদ্রা ও জগন্নাথ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত।

পূজারীগণ জগন্নাথের সুবর্ণ হস্ত খুলিতেছেন। বলরামের হাত খোলা হইয়া গিয়াছে। লক্ষ শালগ্রামনির্মিত গ্রীবাসম উচ্চ বেদীর উপর দক্ষিণে বলরাম, মধ্যে সুভদ্রা ও উত্তরে জগন্নাথ বিরাজিত। ঘনকৃষ্ণ ও শুভ্র রঙে জগন্নাথের মূর্তি রঞ্জিত। ঘৃতের প্রদীপে বেশ দর্শন হইতেছে। সুভদ্রা ও বলরামও এই রঙেই রঞ্জিত। শ্রীম এইবার শয়নমন্দিরে উত্তরের দিকে গিয়া দাঁড়াইলেন দক্ষিণের দরজার বরাবর। বলরামকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার স্বর্ণহস্ত খোলা হইয়াছে। পূজারী উহা লইয়া শয়নমন্দিরে আসিয়াছেন। ইহাই ভাণ্ডার। মনোরঞ্জন ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, এই বলরামের সোনার হাত। শ্রীম অন্তর্মুখীন, কর্ণে ঐ কথা প্রবেশ করিল না। অন্তেবাসী শ্রীম-র পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া কর্ণের নিকট মুখ লইয়া বলিলেন, বলরামের হাত। শ্রীম অগ্রসর হইয়া যুক্ত করে ঐ সুবর্ণ হস্ত স্পর্শ ও প্রণাম করিলেন। ভক্তগণও তাঁহারই অনুকরণ করিলেন। এখন বাহিরে আসিবেন। তাই ইতিপূর্বে যে স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন সেই দক্ষিণ দিকে কোণে পিলারের নিকট আসিয়া পুনরায় দাঁড়াইলেন। যুক্ত করে গদগদভাবে জগন্নাথকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন জন্মের মত। এই শরীরে আবার এই রাজবেশ দর্শন করিবার সুযোগের সম্ভাবনা নাই।

শয়নমন্দিরের দক্ষিণের দরজার বাহিরে শ্রীম আসিয়াছেন। পূর্ব দিকে মন্দিরের ম্যানেজার রায় বাহাদুর সখীচাঁদ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমকে দেখিয়া তিনি অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তাঁহারই সাগ্রহ ব্যাকুল আমন্ত্রণে শ্রীম এবার পুরীতে আসিয়াছেন। তাঁহার আমন্ত্রণকেই শ্রীম জগন্নাথের আহ্বান মনে করেন। অন্তেবাসী বিনয়কে বলিলেন, এঁকে বল না যদি গর্ভমন্দিরে যাওয়া যায়। বিনয় বলিলেন, কিন্তু সখীচাঁদ দুঃখিত হইয়া জানাইলেন, মেঝেতে জল পড়ে গেছে — এখন আর হয় না।

শ্রীম চত্বরে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য, শয়নমন্দিরে প্রবেশপথের পূর্ব ধারে, মন্দিরগাত্র হইতে দেড় হস্ত দক্ষিণে। শ্রীম-র পশ্চাতে বাম হাতে খাজাঞ্চির ঘর আর সম্মুখে শয়নমন্দিরের সিঁড়ি শ্রীম-র বাম হাতে উত্তরাস্য বিনয় ও মনোরঞ্জন, আর ডান হাতে দক্ষিণাস্য জগবন্ধু। শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মস্তকের উপর ভাঁজকরা মটকার চাদর, শীতকালে

ঠাণ্ডা না লাগে তাই। ধ্যানের প্রথমেই যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। তারপর ঐ যুক্ত কর স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিলেন। শ্রীম-র শরীর কখন দুই পার্শ্বে দুলিতেছে, কখনও সম্মুখে কখনও পশ্চাতে, শেষে একেবারে স্থির, নিশ্চল।

অসংখ্য যাত্রী মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে আবার বাহিরে যাইতেছে দলে দলে। সিঁড়ির নিচে ভীড় লাগিয়া আছে। দুইটি হিন্দুস্থানী দল পরপর মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। প্রতি দলে ত্রিশ জনেরও অধিক। গ্রাম্য লোক সব। স্ত্রীলোকই বেশি। তাহারা গান গাহিতেছে। কি আনন্দ! কত কষ্ট করিয়া তাহারা এখন জগন্নাথের পদপ্রান্তে উপস্থিত। সারা জীবনের শুভ বাসনা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জগন্নাথ তাহাদিগকে টানিয়াছেন। ভারতীয়দের বিশ্বাস, জগন্নাথ টানিলে তবেই জগন্নাথের দর্শন সম্ভব। তাই যাত্রীদের নয়নে প্রেমাশ্রু — কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আনন্দে।

দ্বারীগণ সুপারির খোলার চাবুক দিয়া যাত্রীদের পিঠে ঠাশ ঠাশ করিয়া আঘাত করিতেছে। আর বলিতেছে, চল, চল। পরম আহ্লাদে যাত্রীগণ ঐ আঘাত প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেছে। যাহার পিঠে আঘাত পড়ে নাই, সেও আনন্দে বলিতেছে, বাবা, মেরে পিঠমে মার। ভীড় যাহাতে না হয় সেইজন্য এই প্রহার। আঘাত নামমাত্র। যাত্রীগণ মনে করে ইহা জগন্নাথের প্রহারপ্রসাদ, সৌভাগ্যের চিহ্ন। আর এই আঘাতে শরীর ও মনের সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

কেহ দ্বারে নৃত্য করিতেছে। সারা জীবনের অতি অল্প সঞ্চয় আজ শুভ ফলপ্রসূ হইয়াছে। গ্রাম্য লোকগণ আজ জগন্নাথ-দর্শনোন্মুখ। নিজেদের ধন্য মনে করিতেছে, কৃতকৃত্য মনে করিতেছে। তাই এই নৃত্য এই আনন্দ, এই স্তুতি ও মিনতি। ধর্ম যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এই দরিদ্র সরল যাত্রীদের ভিতর।

চাতালের উপর বসিয়া পাণ্ডাগণ, কেহ টাকাকড়ির হিসাব করিতেছে, কেহ বা টাকা মেঝের উপর আঘাত করিতেছে ভাল কি মন্দ পরীক্ষার জন্য। কেহ কেহ যাত্রীদের বলিতেছে, 'ইয়ারে দিয়, ইয়ারে দিয়।'

২

জগন্নাথধাম, রামেশ্বর, সারদা ও বদ্রীনারায়ণ — ভারতের চারি দিকে এই চারিধাম, মুক্তি ক্ষেত্র। অনাদি কাল হইতে পবিত্র। ইহারা যেন সনাতন হিন্দুধর্মের চারিটি দ্বারপাল। ভারতের হিন্দুগণ মনে করে এই চারি ধাম দর্শন করিলে লোক সর্বপাপবিনির্মুক্ত হয়। আর এই ধামে শরীর ত্যাগ করিলে সদ্যমুক্তি লাভ করে জীব। ভারতের আচার্যগণ যুগে যুগে আসিয়া এই মহাবাণী প্রচার করেন। ভগবান শঙ্করাচার্য এই চারি ধামে চারিটি মঠ স্থাপন করেন ধর্মের সংরক্ষণের জন্য। এই জগন্নাথ ধামেও গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য। ভগবান রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্যও জগন্নাথ ধাম দর্শন করেন। ভগবান চৈতন্যদেব এই পুরী ধামে বিংশতি বর্ষ নিবাস করেন এবং এখানেই মহাসমাধি লাভ করেন।

পৌরাণিক মতে জগন্নাথদেবের মূর্তির নাভিদেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহাবশেষ রহিয়াছে। কেহ বলেন, উহা ভগবান বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ। প্রাচীন ইতিহাস অতীতের গর্ভে নিহিত। কালের ঐ সুগভীর গর্ভ হইতে খাঁটি সত্য বাহির করা দুঃসাধ্য। কতবার এই জগন্নাথ মন্দির গড়িয়াছে, কতবার ভাঙ্গিয়াছে। কখনও এ স্থান শাক্ত ও বৈষ্ণবের আবাসস্থল হইয়াছে। আবার বৌদ্ধ ও জৈনগণও এখানে ধর্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণের শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে আছে, প্রথম মন্দির স্থাপন করেন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন। কথিত আছে, বিশ্বকর্মা প্রথম মন্দির ও জগন্নাথমূর্তি নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মিত হওয়ার পর জগন্নাথমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। কথা ছিল, মন্দির অভ্যন্তরে মূর্তি রচনা শেষ না হইলে যেন মন্দির উন্মুক্ত করা না হয়। কিছুকাল ধরিয়া পাথর কাটার ঠুকঠাক শব্দ শোনা না যাওয়ায় মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলা হয় বলিয়া বিশ্বকর্মা মূর্তি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অন্তর্ধান করেন। তাই জগন্নাথমূর্তি অসম্পূর্ণ, হস্তপদহীন।

জগন্নাথের বর্তমান মূর্তি শনপাট-নির্মিত। প্রতি দ্বাদশ বর্ষ পর নূতন মূর্তি রচিত হয়। বর্তমান মন্দির উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা নির্মিত হয় ত্রয়োদশ শতকে। মতান্তরে, দ্বাদশ শতকে অনঙ্গ ভীমদেব কর্তৃক নির্মিত হয় এই মন্দির ১১৮৯ খ্রীস্টাব্দে। তিনি ঐ বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার রাজ্যকাল শেষ হয়। ইহারই

পূর্বে একাদশ শতকে কেশরী রাজগণ ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেন।

ইতিহাসের পরম্পরা সঠিক না থাকিলেও জগন্নাথধাম যে জাগ্রত মহাতীর্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কত তপস্বী, কত মহাপুরুষ এই স্থানে বাস করেন, কত জন এখানে ঈশ্বর দর্শন করেন। কত জন এখনও এখানে নিবাস করিতেছেন, আর ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিতেছেন। তাই ইহার বাতাবরণ অত পবিত্র ও ঈশ্বরভাবোদ্দীপক।

হিন্দুগণ ইতিহাসের উপর তেমন দৃষ্টি দেয় না। তাহারা দৃষ্টি দেয় এই স্থানের জীবন্ত ভাবের উপর। কত শোকতাপে বিদগ্ধ জনগণ এখানে আসিয়া সংসারের সকল জ্বালা ভুলিয়া যায় — ইহা প্রত্যক্ষ। চির শান্তিলাভ, চির সুখলাভ সকল ধর্মের মূলমন্ত্র। তাই এই সকল মহাতীর্থে আসিয়া লোক সাময়িক শান্তিসুখ লাভ করিতেছে অহরহ।

ভগবানই স্বয়ং তীর্থরূপে প্রকটিত হন। তিনি যেমন সুখদুঃখময় সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি এই সংসারে স্থানে স্থানে তীর্থ, দেবালয়, তপস্যা, সাধু, ভক্তও করিয়াছেন। এই সেদিন যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ কথামৃতকার শ্রীমকেও এই কথাই বলিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সন্দিগ্ধমনা শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, তুমি কেবল তাঁকে ডাক কি করে তাঁর দর্শন হয়। নিজের জন্য ভাব। যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন নিমেষে, তিনিই জীবরক্ষার জন্য যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থাও করেন। একদিকে যেমন দেহরক্ষার জন্য যাবতীয় আহার জল বায়ু সৃষ্টি করেছেন, পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহের সৃষ্টি করেছেন, তেমনি যে ঈশ্বরকে কেবল চায় তার জন্য সাধু দেবালয় মহাপুরুষ এবং তীর্থও সৃষ্টি করেছেন। তোমার কাজ তাঁকে ডাকা। অবশিষ্ট সব কাজ তিনি করবেন। শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্নাথধামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, যাও দর্শন করে এসো। আমিই জগন্নাথ।

অনন্তকাল হইতে তীর্থদর্শন সংসারী জীবগণের অবশ্য কর্তব্য। সিদ্ধ আচার্যগণ কেন এই নিয়ম করিলেন? মূর্তিদর্শন ছাড়াও তীর্থে জীবন্ত মানুষ দর্শন হয় — যাঁহারা ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন, কিংবা দর্শনের জন্য ব্যাকুল। ইঁহাদের দর্শনে, আশীর্বাদগ্রহণে জীবগণের কাহারও কাহারও চৈতন্য লাভ হয়, আর ঈশ্বরদর্শনের জন্য তপস্যায় ব্রতী হয়। কেহ সংসার

ত্যাগ করে। কেহ বা সংসারে থাকে — আগে ঈশ্বর পরে সংসার, এই সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া।

ভক্তগণ শ্রীম-র পার্শ্বে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। শ্রীম গভীর ধ্যানে মগ্ন। ইতিমধ্যে আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। সেই চন্দ্রকিরণে মন্দিরশীর্ষ, অঙ্গন এবং অন্যান্য মন্দির ইত্যাদিও আলোকিত হইয়াছে। শীতকাল। সাতটা বাজিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। শ্রীম ধ্যান ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। পুনরায় তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন — যেন সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন করিতেছেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিয়াছিলেন, আমিই পুরীর জগন্নাথ। সেই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া বুঝি ঠাকুরকেই দর্শন করিতেছেন জগন্নাথমূর্তিতে। এইবার মুকুন্দও আসিয়া মিলিত হইলেন। ভক্তগণ শ্রীম-র চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছেন, যাহাতে শরীরে ভীড়ের ধাক্কা না লাগে। এতক্ষণ দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এখন হঠাৎ দৌড়িয়া গিয়া শয়নমন্দিরের ভিতর উত্তর দিকে দাঁড়াইলেন। বলরামকে দর্শন করিতেছেন। পরে গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

এখন বাহিরে আসিলেন সিঁড়ির পশ্চিম দিক দিয়া। অঙ্গনে দাঁড়াইয়া প্রথমে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, পরে পূর্ব দিকে। পূর্বাকাশে পূর্ণচন্দ্র মন্দিরশীর্ষ আলোকিত করিয়া উঠিয়াছে। শ্রীম চাঁদ দেখিতেছেন। চাঁদ শ্রীম-র অতি প্রিয়। শ্রীম বলিতেছেন, এই চাঁদ ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। তাই আমাদের পরমাত্মীয়।

এইবার শ্রীম পশ্চিম দিকে ফিরিয়াছেন। সম্মুখে বিমলাদেবীর মন্দির। জগন্নাথমন্দিরের জল নির্গমনের প্রণালী কাষ্ঠখণ্ডে আবৃত। শ্রীম লম্ফ দিয়া উহা পার হইয়া বিমলামন্দিরে যাইতেছেন। সম্মুখে রোহিণীকুণ্ড। দুই হস্তে রোহিণীকুণ্ডের অভ্যন্তর স্পর্শ করিয়া উহা স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন।

শ্রীম নাটমন্দিরে আলোর নিচে দাঁড়াইয়া আছেন ও বিমলামাতাকে যুক্ত করে দর্শন করিতেছেন দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র ডান হাতে দেবী গর্ভমন্দিরে বিরাজিতা পূর্বাস্য, বিশ হাত দূরে। নাটমন্দির ও গর্ভমন্দিরের মধ্যস্থলে শয়নমন্দির। পুরীর সকল মন্দিরই এই তিন ভাগে বিভক্ত। বিমলাদেবী

সতীর শরীরের একান্ন ভাগের এক ভাগ। ইহা মহাপীঠ। শ্রীম দেবীকে প্রণাম করিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদের বলিতেছেন, দাও দাও — এক একটা করে পয়সা দাও। ষষ্ঠীদেবীকে যুক্ত করে প্রণাম করিয়া উত্তরের সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিলেন নৈঋত হইতে ঈশান কোণে।

বেণীমাধবের মন্দিরের সোপানে প্রণাম করিয়া গোপেশ্বর শিবমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। করজোড়ে প্রণাম করিয়া সাক্ষীগোপালের মন্দিরে আসিলেন। সিঁড়ির দুই হাত দূরে দাঁড়াইয়া বাহির হইতেই যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। এই মন্দিরের পাশ দিয়া পশ্চিম দরজা। রাস্তার পরপারে সত্যভামার মন্দির। দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া শ্রীম শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মধ্যস্থল হইতে দুই হাত পূর্বে দক্ষিণাস্য দেবীকে ডান হাতে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। জগবন্ধু, বিনয়, মুকুন্দ ও মনোরঞ্জন সঙ্গে। বলিলেন, দাও পয়সা দাও — কেউ এখানে কেউ ওখানে। তারপর দেখিলেন, ষষ্ঠী, সাবিত্রী ও গায়ত্রী মন্দির। এইস্থানে আসিয়া নীলমাধব মন্দিরের পাণ্ডারা শ্রীমকে লইয়া গেলেন। ইঁহারা জগন্নাথের জ্ঞাতি পাণ্ডা। শ্রীম বলিলেন, পূজার ফুল কোথায় পাব? ফুল ছাড়াই শ্রীম নীলমাধবের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম নিবেদন করিলেন।

কথিত আছে, নীলাচল পাহাড়ে নীলমাধব প্রথম শবরগণ কর্তৃক পূজিত হইতেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশে নীলমাধবকে পূজা করেন। সেই নীলমাধবই পরে জগন্নাথরূপে বিরাজমান। এইবার লক্ষ্মীর মন্দির। দক্ষিণের সিঁড়ির পূর্ব প্রান্ত দিয়া শ্রীম শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেবীকে ডান হাতে রাখিয়া দক্ষিণাস্য শ্রীম ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। দেবী গর্ভমন্দিরে। তারপর নাটমন্দিরে যাইতেছেন, দেবী পিছনে। নাটমন্দিরে দেবীর সম্মুখে বসিয়াছেন প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ দিকে উত্তরাস্য, দেয়ালের দুই হাত পূর্বে। দেবী বাম হাতে। শ্রীম-র পশ্চাতে জগবন্ধু। ডান ও বাম হাতে বসিলেন মুকুন্দ, মনোরঞ্জন ও বিনয়। নাটমন্দিরে রামচন্দ্রের একটি মূর্তির অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে। শ্রীম ডান হাতে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শ করিয়া দক্ষিণাস্য প্রণাম করিয়া পূর্বমুখী সিঁড়ি দিয়া অঙ্গনে অবতরণ করিলেন।

৩

অঙ্গনে নামিয়া প্রথমে পূর্ব মুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ডান দিকে ফিরিলেন। শ্রীম-র সম্মুখে জগন্নাথের মন্দির। চন্দ্র মন্দিরের শীর্ষদেশ কিরণজালে আবৃত করিয়াছে। শ্রীম অন্তেবাসীকে ঐ চন্দ্র দেখাইয়া হঠাৎ বলিলেন, এই দেখ কেমন চন্দ্র! এখানে একটি কথা মনে পড়ল ঠাকুরের। আমাকে বলেছিলেন, বৃদ্ধ ও তর্জনী সংযুক্ত করে, তোমাকে মায়ের এইটুকুন কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শোনাতে হবে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর অহর্নিশ অতন্দ্রিত হয়ে ঐ কাজ করছি। কিন্তু এখনও ছুটি দিচ্ছেন না। আর তোমরা এইটুকুন করতে নারাজ।

শ্রীম অন্তেবাসীকে একটা কাজ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। অন্তেবাসী উহা করিতে চান না। তাই পূর্বোক্ত কথা বলিলেন।

শ্রীম পুনরায় কথা বলিতেছেন — ঠাকুরের কাজ করলে মুক্তি হয়। আর সংসারের কাজে লোক বদ্ধ হয়। তাঁর কাজ যে করে সে যে নিজে ধন্য হয়! ঈশ্বরের কি? তিনি বলেছেন আমাকে, মা এক টুকরো খড়কুটো থেকে বড় বড় আচার্যের সৃষ্টি করেন। সত্যিই তো তাই। এখন দেখছি, ঐ কথা সত্য হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম সন্ন্যাস — আর ঠাকুর বললেন, মায়ের ইচ্ছা তুমি ঘরে থেকে তাঁর কাজ কর, তাঁর কথা লোককে বল। তাঁর কথাই অনন্ত কাল সত্য। তাই দেখছি সত্য হচ্ছে। ক্রাইস্ট বলেছিলেন, জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, সব অসত্য হবে, কিন্তু ঈশ্বরের কথা চির সত্য — 'Heaven and earth shall pass away : but my words shall not pass away'।

ঋষিগণ তাই জগৎকে বলছেন চলমান, মানে নাশবান। ঈশ্বর অচল, তাঁর কথা অচল — মানে সত্য। Contemporary (সমসাময়িক) লোক বুঝতে পারে না তাঁর কথা। মনে করে, তিনিও মানুষ। 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াং মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' (গীতা ৯-১১)। তাই অবতারের কথা শুনতে হয়। তাঁর পার্ষদদের কথা শুনতে হয়। অবতারের কাজে যারা লাগে তারা ধন্য। তারা আপনার লোক তাঁর। আপনার লোক, ঘরের লোক কাজ করবে না তো কে করবে? তাদের মুক্তির ভার অবতারের হাতে তারা অঙ্গ উপাঙ্গ। ঠাকুর এদিকে মানুষ, আর অন্য দিকে সচ্চিদানন্দ। আমাদের

দেখিয়েছেন নিজের রূপ। বেদে যাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলে, সেই পুরুষই ঠাকুর। তাঁর সেবায় সদ্যমুক্তি। মুক্তি কি বল, তারা যে তাঁর আপনার অঙ্গ উপাঙ্গ! তাঁর কাজ স্বেচ্ছায় করতে হয়। যদি বল, বড় কঠিন — তা-ও তিনি দূর করেছেন। আমরা কি তাঁর কাজ করছি? তিনিই তাঁর কাজ করছেন — যন্ত্র আমরা। যারা অবতারের কথা মেনে চলে, তারা সদানন্দ — জীবিতাবস্থায় তাদের আনন্দ, মৃত্যুর সময় আনন্দ, মৃত্যুর পরও আনন্দ — আনন্দ যে তাদের স্বরূপ!

শ্রীম-র কথা শুনিয়া একটি ভক্ত ভাবিতেছেন, ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, তোর ঘাড়ে করবে। স্বামীজী শ্রীমকে বলেছিলেন আমেরিকা থেকে ফিরে বলরাম মন্দিরে, 'আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে বাঁদরনাচ নাচিয়েছেন, এই ক'টা বছর'। আর এখন শ্রীম বললেন, পঞ্চাশ বছর কাজ করছি, এখনও ছুটি দিচ্ছেন না। কি প্রহেলিকা!

শ্রীম এবার জগন্নাথ মন্দিরের বাহিরে উত্তর দিকের শয়নমন্দিরের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া কারুকার্যখচিত স্তম্ভগুলি দর্শন করিতেছেন পশ্চিমদিক হইতে সবগুলি স্তম্ভ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। এদিকে চলিতে চলিতে জগন্নাথের নাটমন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সিঁড়ি বাহিয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া অগ্নিকোণে মুখ করিয়া বাম দিকের দেয়ালের গায়ে অঙ্কিত মূর্তিসমূহকে প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। শ্রীম-র ডান হাতে অদূরে গরুড় স্তম্ভ।

এবার ঘুরিয়া ডান হাতের, পিছনের ও বাম দিকের পিলারের গায়ে ও উপরের চন্দ্রাতপে অঙ্কিত মূর্তিসমূহকে যুক্ত করে ভক্তিভরে দর্শন ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। এইস্থান হইতে সোজা গরুড় স্তম্ভের নৈর্ঋত কোণের অপর একটি স্তম্ভের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি পাণ্ডা আসিয়া বলিল — আস বাবু, দর্শন করবে। চল ভিতরে নিয়ে যাই। গর্ভমন্দির এখন বন্ধ। ভোগের পর খুলিবে। বিনয় তাই পাণ্ডাকে বলিলেন — না দরকার নাই।

শ্রীম এখন গরুড় স্তম্ভের দক্ষিণ দিকের স্তম্ভটির ডান হাতে দাঁড়াইয়া মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত দশাবতার চিত্রকে যুক্ত করে প্রণাম করিতেছেন। তারপর ডান হাতে ঘুরিয়া সোজা পশ্চিম দিকে গেলেন। চতুর্থ স্তম্ভের

পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। স্তম্ভগাত্রে, দেয়ালে ও উপরে চন্দ্রাতপে অঙ্কিত নানা পৌরাণিক দৃশ্যাবলী দর্শন করিতেছেন। ইহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভের মধ্যস্থল দিয়া ডান হাতে একটু ঘুরিয়া আবার পূর্ব মুখে আসিলেন। শ্রীম-র পশ্চাতে জগন্নাথমূর্তি।

গরুড়স্তম্ভের নিকট শ্রীম পুনরায় আসিলেন। আর দক্ষিণ হস্তে স্তম্ভের দক্ষিণাংশ স্পর্শ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব দিব্যভাবে সর্বদা এই স্তম্ভকে আলিঙ্গন করিতেন। ঐ স্তম্ভগাত্রে ক্ষুদ্র একটি গর্ত দেখাইয়া পাণ্ডারা বলে, চৈতন্যদেবের হাত এই স্তম্ভগাত্রে রাখিতে রাখিতে এই গর্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীম বারংবার গরুড় স্তম্ভকে ভক্তিতে যেন বিগলিত হইয়া স্পর্শ প্রণাম ও আলিঙ্গন করিতেছেন। ভক্তরা ভাবিতেছেন, শ্রীম বুঝি শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন! আর এই স্তম্ভ বুঝি শ্রীম-র নিকট জীবন্ত প্রতিভাত হইতেছে! শ্রীম-র পূর্বস্মৃতি কি জাগ্রত হইল?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বকুলতলায় এই চক্ষে জীবন্ত চৈতন্যসংকীর্তন দর্শন করিয়াছিলেন। আর তাহাতে তিনি শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন। শ্রীম চৈতন্যপার্ষদ ছিলেন পূর্বাবতারে। আর এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, 'আমি চৈতন্য'। নরেন্দ্রকেও বলিয়াছিলেন, 'আমি সেই গৌর'।

এইবার পার্শ্বস্থ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের মধ্য দিয়া নাটমন্দির হইতে বাহিরে যাইবার জন্য দক্ষিণ দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। দরজা বন্ধ। তাই হাতের ইঙ্গিতে উত্তরের দরজা দেখাইয়া ভক্তদের বলিলেন, চল ওদিকে। শ্রীম উত্তরমুখী হইয়া সিঁড়ির ডান দিক দিয়া অঙ্গনে অবতরণ করিতেছেন, পশ্চাতে জগবন্ধু বিনয় মুকুন্দ মনোরঞ্জন।

একটি ভক্ত (স্বগত) — শ্রীচৈতন্য-চরণপ্রান্তে শ্রীম উত্তরাস্য। দেখিতেছি, জগন্নাথের মন্দিরে শ্রীম-র দেহজ্ঞান বিলুপ্ত। অত খুঁটিনাটি করিয়া গ্রাম্য বিশ্বাসী ভক্তদের মত অত সব মন্দির কি করিয়া দর্শন প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতেছেন অত ভক্তিভরে এই বৃদ্ধ শরীরে? আজ আবার সমস্ত দিন ভুবনেশ্বরের সব দর্শন করিয়াছেন। কি করিয়া অত পরিশ্রম সম্ভব? ভগবানে মন বিলগ্ন থাকিলেই কেবল ইহা সম্ভব। আর কেনই বা এইসব দর্শন করিতেছেন? উনি তো ঠাকুরের কৃপায় আত্মারাম জীবন্মুক্ত

মহাপুরুষ। ভক্তদের শিক্ষার জন্য কি?

শ্রীম সর্বদা বলিয়া থাকেন — এই মহাতীর্থে, সারাদিন দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমা করিতে হয়। ইহারই নাম ভক্তি। ইহাতেই লোক সিদ্ধ হইয়া যায়। শুধু বলিয়াই শ্রীম ক্ষান্ত হন না। নিজে আচরণ করিয়া উপদেশের প্রাণ সঞ্চার করেন — বাজনার বোল হাতে আনেন। তাইতো ভক্তদের অনিচ্ছুক মনও অত সরস ও সাবলীল হইয়া উঠে।

পৌষ মাস। রাত্রি আটটা। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চন্দ্রের উজ্জ্বল স্বচ্ছ কিরণে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত। মন্দিরশীর্ষ, অঙ্গন, বৃক্ষরাজি চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীম প্রশান্ত নির্মল ও সুশীতল চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইয়া আছেন উত্তরাস্য। সম্মুখে তিন হাত দূরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির। ইহা জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় উত্তরপূর্ব কোণে ত্রিশ হাত দূরে। মন্দিরের চারিদিক উন্মুক্ত, রেলিং দিয়া বেষ্টিত। অভ্যন্তরে বৃহৎ শ্বেত পাথরের অতি বৃহৎ দুইটি পদচিহ্ন চন্দনে লিপ্ত, তুলসীদলে আচ্ছাদিত। মহিলা ভক্তগণ পূর্ব দরজায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, প্রসাদী চন্দন তুলসী লইতেছেন। শ্রীম দক্ষিণ দিকের রেলিং-এর ভিতর হাত দিয়া চরণ স্পর্শ করিয়াছেন। আর দক্ষিণ দিকে গিয়া এবার ছয় হাত দূরে দাঁড়াইয়াছেন অগ্নিকোণে মুখ করিয়া। শ্রীম-র বাম হাতে চরণমন্দির, ডানহাতে সত্রভোগের মন্দিরকোণ। মহিলা ভক্তগণ চলিয়া গেল। শ্রীম পুনরায় চৈতন্য-চরণমন্দিরে গিয়া পূর্ব দিক হইতে শ্রীচরণযুগল স্পর্শ ও প্রণাম করিলেন।

৪

এইবার শ্রীম ধীরপদে চলিয়াছেন আনন্দবাজারে। অঙ্গন দিয়া চলিতেছেন অগ্নিকোণের দিকে। সত্রভোগের মন্দিরের উত্তর দেয়ালের বরাবর একটু দাঁড়াইয়া পূর্বমুখী আনন্দবাজারের ফটক পার হইলেন। তারপর উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার মোড় পার হইলেন পূর্ব রাস্তার মধ্যস্থলের এক হাত উত্তরে ও উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার এক হাত পূর্বে গিয়া দাঁড়াইলেন পশ্চিমাস্য হইয়া। শ্রীম-র ডান হাতে মহাপ্রসাদের দোকানসমূহ। মাটির বড় ছোট মাঝারি হাঁড়ীতে অন্ন, ডাল ও তরকারী। তরকারী সব লবণশূন্য। টাটকা

মহাপ্রসাদ। খুব সস্তা। বিনয় এক পয়সার অন্ন ও ডাল খরিদ করিলেন। শ্রীম দক্ষিণ দিকের ফটকের বরাবর অগ্রসর হইয়া উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার মধ্যস্থলের এক হাত পূর্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন দক্ষিণাস্য। বিনয় দুইটি ভগ্ন খোলাতে অন্ন ও ডাল শ্রীম-র সম্মুখে ধরিলেন। শ্রীম প্রণাম করিয়া উভয় প্রকার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণ সকলে অবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। জগন্নাথের মন্দিরে মহাপ্রসাদের স্পর্শদোষ নাই। এখানে সকল জাতের লোক একসঙ্গে বসিয়া মহাপ্রসাদ আহার করে। মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না। একজন প্রসাদের সবখানি খাইতে না পারিলে অপর একজন ঐ মহাপ্রসাদ খাইয়া ফেলে। এখানেও বিচার ও বিশ্বাসের সংঘর্ষ। বিশ্বাসেরই জয় অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। স্বাস্থ্যনিয়ম ভঙ্গ করিয়া এই বিশ্বাসের নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

এবার শ্রীম রাস্তার পশ্চিম দিক ঘেঁষিয়া দক্ষিণের ফটকের দিকে চলিতেছেন। ফটকের সিঁড়িগুলি অতি সন্তর্পণে পার হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশদ্বারের দ্বিতীয় ফটকের নিচের দ্বিতীয় সিঁড়িতে অবতরণ করিলেন।

যাত্রীগণ অরুণস্তম্ভ পার হইয়া শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে উপনীত হয়। তাহার পর অতি প্রশস্ত ও দীর্ঘ অষ্টাদশটি প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ফটকে উঠে। শ্রীম দ্বিতীয় ফটকের নিম্নে দ্বিতীয় সোপানে দাঁড়াইয়া আছেন পূর্বাস্য। শ্রীম-র শিরোপরি পূর্ণচন্দ্র। ভক্ত যাত্রীগণ কেহ প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা বহির্গত হইতেছে। বেশ ভীড়। শ্রীম-র বাম হস্তে আনন্দবাজারের প্রবেশপথ। পশ্চাতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশের দ্বিতীয় ফটক। শ্রীম এবার অতি ধীরে নিম্নে নামিতেছেন সোপানশ্রেণীর মধ্যস্থলের একটু উত্তর দিক দিয়া। শ্রীম-র সম্মুখ ভাগের নিম্নে সিংহদ্বার। একাদশটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বদনে তাঁহার 'শম্ভো শম্ভো' — এই মহামন্ত্র। শ্রীম-র দক্ষিণ হস্তে শিব ভৈরবরূপে দ্বাররক্ষা করিতেছেন। মন্দিরে প্রবেশের সময় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখন মন্দিরে ভগবানদর্শন করিয়া যাইবার সময়ও মহাদেবকে প্রণাম প্রার্থনা ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়া যাইতেছেন। শ্রীম-র মুখমণ্ডলের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ ভগবান দর্শন করিয়া। তাই অত প্রার্থনা প্রণাম ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন।

শ্রীম-র নিকট বুঝি মহাদেব জাগ্রত, জীবন্ত।

এইস্থানের নিম্নে আরও ছয়টি সোপান। সাবধানে শ্রীম অবতরণ করিতেছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। একটি সোপানমাত্র অবশিষ্ট। এখানে সুখেন্দু আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি মন্দিরে দর্শন করিতে যাইতেছেন। বিনয়ও তাঁহার সঙ্গে পুনরায় মন্দিরে চলিয়া গেলেন। তিনি কণিকা মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিবেন। আগামীকাল ভক্তগণ উহা ভক্ষণ করিবেন। উহা শুদ্ধ ঘি-ভাত — এখানকার শ্রেষ্ঠ মহাপ্রসাদ। শ্রীম এবার সিংহদ্বার পার হইলেন। মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া নতশিরে সিংহদ্বারের রজঃ মস্তকে ধারণ করিলেন। এক মিনিট দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি, জগন্নাথকে মনে মনে বিদায়কালীন প্রণাম করিতেছেন।

কথিত আছে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর তপস্বী শিষ্য শুকদেবতুল্য স্বামী তুরীয়ানন্দ সিংহদ্বারের রজঃ মস্তকে ধারণ ও প্রণাম করিয়া যেই মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিলেন অমনি দেখিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্ময় দেহে উপরে দাঁড়াইয়া আছেন অষ্টাদশ সোপানে, দ্বিতীয় ফটকের সম্মুখে। আনন্দে আপ্লুত হইয়া স্বীয় গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া যেই উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন তাঁহার আর দর্শন পাইলেন না। 'আমিই জগন্নাথ' — শ্রীম-র নিকট কথিত ঠাকুরের এই মহাবাণী যে সত্য তাহার প্রমাণ স্বামী তুরীয়ানন্দের এই দিব্যদর্শন।

সিংহদ্বারের বাহিরে শ্রীম প্রসাদী হাত ধুইতেছেন জলকূপের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া। মনোরঞ্জন হাতে জল দিতেছেন। ভক্তগণ মানুষে-টানা গাড়ী ডাকিতে যাইতেছেন। শ্রীম কহিলেন, দেখুন দু'আনায় হয় তো নিন্। কেহই রাজী নয়। শ্রীম বলিলেন, তা হলে হেঁটেই যাচ্ছি। এই বলিয়া রওনা হইয়া পড়িলেন। বড় রাস্তা অতিক্রম করিয়া পূর্ব দিকে মিষ্টান্নের দোকানে গিয়া দাঁড়াইলেন। এখানে সকলে জুতা রাখিয়া গিয়াছেন। মনোরঞ্জন চটিজুতা ও লাঠি আনিয়া দিলেন। শ্রীম সমুদ্রের দিকে চলিতেছেন পূর্বাস্য রাস্তার ডান দিক দিয়া। তাঁহার পায়ের চটিজুতা হইতে চটর্ চটর্ শব্দ হইতেছে। আর প্রতি বাম পদবিক্ষেপের সঙ্গে দক্ষিণ হস্তস্থিত লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতে করিতে শ্রীম চলিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্ণচন্দ্র।

দুই পার্শ্বের দোকান ও বাড়িতে লণ্ঠনের মিটমিট্ আলো জ্বলিতেছে, কোথাও বা পেট্রোম্যাক্স। পুরীতে এখনও বিদ্যুতের আলো আসে নাই। জগবন্ধু শ্রীম-র বাম হাতে আর মুকুন্দ ও মনোরঞ্জন পশ্চাতে চলিতেছেন। সুয়ারসাই-র একটু পূর্ব দিকে সদর রাস্তার দক্ষিণে শ্রীম দাঁড়াইলেন ক্ষণকালের জন্য। শ্রীম-র দক্ষিণ হস্তে পূর্ব দিকে একটি বাড়িতে প্রবেশের সিঁড়ি। শ্রীম-র বাম হস্তে রাস্তার উত্তরে একটি দ্বিতল পাকা বাড়ি। একটি অশ্বযান মন্দিরের দিকে যাইতেছে। রাস্তা অপ্রশস্ত।

এইবার দোলমণ্ডপশাহী। পূর্বমুখী রাস্তার দক্ষিণ দিকে একটি ইষ্টকনির্মিত চাতাল। ভক্তিনম্র শ্রীম উহার অগ্নিকোণ ঘেঁষিয়া চলিলেন ফ্ল্যাগ্স্টাফের দিকে। সমুদ্রের শীতল বায়ু এইবার আসিতেছে। শীতকাল। পুরীতে চিরবসন্ত। কাহারও তাই শীতবোধ হইতেছে না। ভক্তগণের পরিধানে সাধারণ পোশাক। কেবল বার্ধক্যবশতঃ শ্রীম-র শরীরে একটি গরম পাঞ্জাবী।

এরপর মুচিশাহী। এইস্থানে আসিয়া শ্রীম একটু দাঁড়াইলেন, রাস্তার দক্ষিণ দিকে। উত্তরে বটবৃক্ষের সারি। আর একটি অশ্বযান যাইতেছে মন্দিরের দিকে। এখানে রাস্তার উত্তর দিকে কয়েকটি বটবৃক্ষ রহিয়াছে। শ্রীম-র বাম হাতে রাস্তার অপর পারে প্রথম বটবৃক্ষ। দ্বিতীয় বৃক্ষের বরাবর রাস্তার দক্ষিণে শ্রীম-র ডান হাতে দুইটি ছাগল দাঁড়াইয়া আছে। একটি কাল, অপরটি সাদা। শ্রীম ডান হাতে ছাগলযুগলকে দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন পূর্ব দিকে। এখানে একটি রাস্তার মোড়। দক্ষিণ দিকে আর একটি রাস্তা যাইতেছে সমুদ্রের দিকে। এই মোড়ে শ্রীম ঈশান কোণ দিয়া চলিয়াছেন। ভক্তরা বলিলেন, ওদিক নয় এদিক দিয়ে আসুন। শ্রীম একটু ডান হাতে ঘুরিয়া চলিলেন। এইবার অগ্নিকোণ দিয়া প্রবেশ করিলেন শশী নিকেতনে। ইহাই শ্রীম-র নিবাসস্থল। বাম হাতে রাস্তার অপর পারে ডাকঘর।

উড়িষ্যা দরিদ্র প্রদেশ। উহার প্রাচীন ইতিহাস ঐশ্বর্য্যবান। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের অবস্থানে উহা চিরকাল আধ্যাত্মিক সম্পদে অতুলনীয়।

শশী নিকেতন। পূর্ব বারান্দায় শ্রীম বসিয়া আছেন একটি টুলে — বেশ পরিশ্রান্ত। ভোর চারিটা হইতে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্তা অনবরত চলাফেরায় রহিয়াছেন। ভক্তগণ সকলেই যুবক। তাঁহারা ভাবিতেছেন, এই

বাহাত্তর বছর বয়সে অত পরিশ্রম কি করিয়া সম্ভব হয় শ্রীম-র পক্ষে। ব্রহ্মানন্দে মন রসায়িত হইলে বুঝি দেহবুদ্ধির অভাব হয়।

গৃহদ্বার বন্ধ। সুখেন্দু চাবি লইয়া গিয়াছেন সঙ্গে, মন্দিরে। জগবন্ধু একটা ফাঁক দিয়া গলাইয়া ছিটকিনি খুলিয়া দিলেন। দরজা দিয়া শ্রীম গৃহে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই অন্তর্বাটিতে প্রবেশ করিলেন। আহার করিবেন। সেখানে শ্রীম-র ধর্মপত্নী গিন্নী-মা থাকেন। তিনি শ্রীম-র আহার প্রস্তুত করেন। ভক্তদিগকে শ্রীম বলিয়া গেলেন, আপনারাও আহার করুন। আজ সকলে ক্লান্ত। ভক্তগণ আজ পুরি কিনিয়া খাইলেন — বিনয়, জগবন্ধু, মুকুন্দ, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু।

আহারান্তে শ্রীম ভক্তদিগের নিকট অল্পক্ষণ বসিয়াছেন। কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — A good day's work (আজকের দিন সফল)। এমনি করে মানুষ যদি সব করে তবে শান্তি। নানান্ কাজে জড়িয়ে সময় হয় না। এই করে জীবন কেটে যায়। যার জন্য এয়েছে সংসারে তার সন্ধান আর হয় না। ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ভগবানদর্শন। তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। সংসারও কর আর চেষ্টাও কর। এ না করলে শেষে খালি সংসারই করে, তাঁকে ভোলে। তাঁর মহামায়ায় সব ভুলিয়ে দেয়। পুরুষকারের দরকার। রোখ্ করতে হয়, বিচার করতে হয় যে-আমি আর দশটা কাজ করছি, সেই-আমি ঈশ্বরের জন্যও কাজ করবো।

আহা, কি অদ্ভুত স্থান এই পুরী! সমুদ্র, জগন্নাথ, বন — সবই আছে। এ সবই বিশাল, তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে খাওয়ার তত চিন্তা নাই। মহাপ্রসাদ সামান্য দামে কেনা যায় আর চৈতন্যদেবের স্পর্শ যেন জীবন্ত হয়ে আছে। এসব অমূল্য সম্পদ রয়েছে। এই সব মনকে হুড়হুড় করে উপরে উঠিয়ে দেয়। আজও যেন তিনি লীলা করছেন — এমনি জাগ্রত জীবন্ত স্পর্শ!

শশী নিকেতন, পুরী।
২৯শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৪ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

সপ্তদশ অধ্যায়

পরিক্রমা

১

শশী নিকেতন। পুরী। সকাল ছয়টা। শীতকাল। জগবন্ধু মুকুন্দ ও সুখেন্দু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিয়া এইমাত্র ফিরিয়াছেন। তাঁহারা চক্রতীর্থে গিয়াছিলেন। বিনয় আশ্রমসেবায় ব্যাপৃত। শ্রীম স্নানাগারে প্রবেশ করিবেন। ভক্তদিগকে একত্র দেখিয়া দক্ষিণ দিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া নানা কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এমন স্থান আর হয় না। সাক্ষাৎ ভগবান এখানে জগন্নাথরূপে রয়েছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছেন, ‘আমিই জগন্নাথ’। আবার চৈতন্যদেবের স্মৃতি। চৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও বলেছিলেন, ‘আমিই গৌরাঙ্গ।’ তিনি চব্বিশ বছর এখানে ছিলেন। শেষের আঠার বছর একটানা ছিলেন। শেষের বার বছর সর্বদাই মহাভাবে থাকতেন। তারপর কত মহাপুরুষ এখানে এসেছেন। কত ভক্ত এখানে বাস করছেন। এদিকে আবার ‘সরসামস্মি সাগরঃ’। একটু বাইরে যাও সব বন। এমনি দুর্লভ স্থান।

মুক্তিক্ষেত্র বলে কিনা — এখানে অনেকে মুক্তিলাভ করেছেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরদর্শন করেছেন। আবার কতজনে তাঁর দর্শনের জন্য চেষ্টা করছেন, কত তপস্যা করছেন! সব ছেড়ে তাঁর জন্য কাঁদছেন। এ সব অমূল্য দিব্য ভাবস্পর্শ রয়েছে এখানকার atmosphere-এ (বাতাবরণে)।

তাছাড়া এ কি আজকার তীর্থ! কবে হয়েছে তার ইতিহাস নাই। তার মানে, অনন্তকাল থেকে আছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য তুচ্ছ — জীবন্ত ভাবস্পর্শ প্রত্যক্ষ।

কেন ঈশ্বর তীর্থরূপে প্রকটিত হন? না, সংসারদগ্ধ জীবগণ এসে জুড়াতে পারবে বলে — যেন ওয়েসিস্ মরুভূমিতে। এখানে জ্ঞান ভক্তি

জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এতে অগ্নির উত্তাপ নাই। কিন্তু জ্যোতির্ময় আভা রয়েছে, যেমন দেবশরীরে থাকে। এতে মনপ্রাণ শান্ত হয়, শীতল হয়। তাই এসব স্থানে তিন দিনও বাস করলে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। এমন স্থানে প্রতিটি মুহূর্ত সৎ কাজে ব্যয় করা উচিত। কথাবার্তা, গল্প, পাঠ, বিচার — এসব অন্যত্রও হতে পারে। এখানে এসে কেবল ঈশ্বরীয় কথা স্মরণ মনন করতে হয়। আর সারাদিন প্রত্যক্ষ দর্শন করতে হয়।

মন্দিরে ভাবরাশি একেবারে জমাটবাঁধা। এক মিনিট থাকলেই একেবারে changed man (নূতন দিব্য মানুষ)। এমনি প্রভাব! শীতল হাওয়ায় যেমন মন শীতল হয় তেমনি মন্দিরে ঢুকলেই মন শান্ত হয়। সংসার ভুল হয়ে যায়। তা হবে না? তিনি যে স্বয়ং রয়েছেন। তিনিই তো সকল শান্তির আকর। সর্বত্র আছেন তিনি। কিন্তু কোথাও কোথাও তাঁর বেশী প্রকাশ। ঠাকুর বলেছিলেন এই কথা। বলেছিলেন, যেমন জল সর্বত্র থাকলেও সাগর নদী প্রভৃতিতে অধিক প্রকাশ তেমনি কোনও স্থানে কোনও ব্যক্তিতে অধিক প্রকাশ। এই থেকেই তো তীর্থ ও মহাপুরুষের সৃষ্টি। এর advantage (সুযোগ) নিতে হয়। একে বলে চাতুরী — 'সা চাতুরী চাতুরী'। যে এই গোলমালের ভিতর থেকে 'মাল'টি বেছে নিতে পারে সেই চতুর, সেই চালাক।

তাই যত বেশীক্ষণ মন্দিরে থাকা যায় ততই ভাল। কত ভক্ত আসছে, দেশ দেশান্তর থেকে। তাদের কত আর্তি! এসব দেখলে নিজের ভেতর থেকেও আর্তি, ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হয়।

ভক্তিতে ভক্তি বাড়ে, বিশ্বাসে বিশ্বাস বাড়ে। সংক্রামক প্রভাব।

সেইজন্য অবসর সময়ে মন্দিরে থাকা উচিত। সকালে উঠে ধ্যান জপ করে একটু সমুদ্র বেড়িয়ে এসে, এদিককার একটু, এদিক ওদিক কাজ করে মন্দিরে চলে যাওয়া উচিত। সেখানে এগারটা পর্যন্ত থাকা। আবার মধ্যাহ্ন আহারাদির পর যাওয়া। আবার সন্ধ্যার পর যাওয়া উচিত। এসব করতে করতে ভিতরে ভাবভক্তি জমা হয়। নিজের না থাকলেও অপরের দেখে নিজের ভিতর জাগ্রত হয় ভক্তি বিশ্বাস।

কেউ হয়তো কাঁদছে, আমার ছেলেকে ভাল করে দাও। কেউ কেঁদে বলছে, আমায় অন্নবস্ত্র দাও। কেউ বলছে, খবর নাও, আমার কেউ নেই

সংসারে। কেউ শুদ্ধাভক্তি, বিশ্বাস চাইছে, অপর কিছু নয় — কেবল শুদ্ধাভক্তি। এসবের প্রভাব অতি জীবন্ত, অতি প্রত্যক্ষ। অমন স্থান কি আর হয়? আর আসা হয় কিনা এ জীবনে, কে জানে। তাই সব ছেড়ে ঐ-তে ডুবে যাওয়া উচিত।

শ্রীম বেলা সাড়ে সাতটার সময় মন্দিরে রওনা হইলেন। সঙ্গে ব্রহ্মচারী পার্থচৈতন্য। ভক্তগণ শীঘ্র আশ্রমের যাবতীয় কর্ম সমাপন করিয়া নয়টার সময় মন্দিরে পৌঁছিলেন — মুকুন্দ, বিনয় ও জগবন্ধু। আজ ভক্তগণ দ্বারী ভৈরবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন। এই সময় জগন্নাথের গর্ভমন্দিরে যাইবার অবসর। ক্ষেত্রবাসী এবং বহিরাগত যাত্রী ও ভক্তগণ এই সময়ে গর্ভমন্দিরে দর্শন প্রণাম ও রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করে। দিনে সাতবার ভোগ লাগে। তাহার আগে ও পরে, দর্শনের ‘অবসর’ গর্ভমন্দিরে। অন্য সময় নাটমন্দির বা শয়নমন্দির হইতে দর্শন লাভ হয়।

মুকুন্দ, বিনয় ও জগবন্ধু আজ গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দর্শন প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গর্ভমন্দিরের ভিতর অনেকক্ষণ এক পাশে দাঁড়াইয়া জপ করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, সত্যই উহা জাগ্রত স্থান। এই কথা শ্রীম-র মুখে আজই বিশেষ করিয়া শুনিয়াছেন। গর্ভমন্দিরে ঈশ্বরের নাম করিলে শীঘ্র চৈতন্যলাভ হয়। মনে হয়, নিজের স্বরূপ — আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান। কি একটা আকর্ষণ ঐ গর্ভমন্দিরে, ঐ মণিকোঠায় রহিয়াছে! অদ্ভুত তাহার আকর্ষণ, অনির্বচনীয় তাহার আনন্দ! সকলের মনেই এই প্রভাব সংক্রামিত হয় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। কিন্তু বাহিরে আসিলে সংসার আসিয়া পুনরায় স্কন্ধে চাপিয়া বসে। যাহারা আন্তরিক ভক্ত, তাহারা বাহিরে আসিয়াও সেই ভাবস্পর্শ, সেই মনপ্রাণ উন্নতকারী দিব্য পবিত্র প্রভাব রক্ষা করিতে পারে।

শ্রীম-র কথায় ভক্তগণ আজ নূতন করিয়া সব দেখিতেছেন। শ্রীম কি আজ চক্ষুতে লাল চশমা পরাইয়া দিয়াছেন? আজ তাহাদের সব ভাল লাগিতেছে, সবই মিষ্ট। কেহ ভাবিতেছে, নিশ্চয় ইহা শ্রীম-র শুদ্ধ সবল সক্রিয় ইচ্ছাশক্তির ফল। মহাপুরুষগণ, অবতারের পার্ষদগণ নিজ ইচ্ছা অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন। ভক্তগণ আজ শ্রদ্ধাভরে একের পর

অপর মন্দির দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাদের ভাল লাগিয়াছে আজ, কাল রাত্রিতে যেমন ভাল লাগিয়াছিল শ্রীম-র সহিত দর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমায়। তাঁহারা দর্শন করিলেন — বিমলা ও বেণীমাধব, গোপেশ্বর ও সাক্ষীগোপাল, গণপতি ও নৃসিংহ প্রভৃতি মন্দির।

২

ভক্তগণ লক্ষ্মীর মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীম নাটমন্দিরে বসিয়া আছেন উত্তর-পশ্চিম কোণে দক্ষিণাস্য। আর তাঁহার সম্মুখে পূর্বাস্য বসা পার্থচৈতন্য। পার্থচৈতন্যকে শ্রীম ঠাকুরের মহাবাক্য শুনাইতেছেন — সাধুর কর্তব্য।

শ্রীম (পার্থচৈতন্যের প্রতি) — ঈশ্বরভজন করা সাধুর একমাত্র কর্তব্য, তার আর কোনও কাজ নাই। 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়' — এই এক কাজ। কেবল ঈশ্বরচিন্তা। (গীতা ১২-৮)।

যদি কর্ম করতে হয় তা-ও করতে হয় গুরুর আদেশ নিয়ে। আর একটা বিষয় থেকে সাবধান করেছিলেন ঠাকুর — মেয়েমানুষ। বলেছিলেন, সাধকের অবস্থায় মেয়েমানুষ — কালসাপ, রাক্ষসী, দাবানল, বাঘিনী। এগুলি সবই মানুষের প্রাণ হরণ করে। তিনি বলেছিলেন, সাধকের অবস্থায় মেয়েমানুষের চিত্রপট পর্যন্ত কেউ দেখবে না।

এ কি আর ঘৃণা করে বললেন, না পক্ষপাতিত্ব করে? না, তা নয়। আত্মরক্ষার জন্য।

বলেছিলেন, ঈশ্বরদর্শন হলে তখন সেই মেয়েমানুষই হয় জগদম্বা, আনন্দময়ী মা, ব্রহ্মশক্তি।

এইসব মন্দিরে এসে এক কোণে বসে ধ্যান জপ করা উচিত, যেখানে লোকের ভীড় সেখানে না যাওয়া — এসব মহাবাক্য ঠাকুরের। আবার স্ত্রীলোকের গায়ের হাওয়া না লাগান সাধকের অবস্থায়।

ভক্ত স্ত্রীলোকদেরও বলেছেন অনুরূপ কথা। তাদেরও পুরুষের সংস্পর্শে না থাকা। কাঁচা অবস্থায় এসব মানতে হয়। না মানলে সর্বনাশ। এইসব নিয়ম মহাপুরুষগণ করে গেছেন। ঠাকুর সর্বভূতে জগদম্বাকে দর্শন করতেন। তথাপি লোকশিক্ষার জন্য এসব নিয়ম নিজে পালন করতেন।

উত্তরপাড়ার রাজবাড়ির মেয়েদের সটান বললেন — না, ঘরে আঁটবে না। ছোকরা ভক্তরা ঘরে ছিল, তাই। মেয়েরা তাঁর ঘরে বসতে চেয়েছিল। এমনতর ব্যাপার।

ভক্তগণকে শ্রীম আজ সকালে উৎসাহিত করিয়াছেন, জগন্নাথ মন্দিরের সকল জিনিস খুঁটিনাটি করিয়া যাহাতে দেখেন। তিনি বলিয়াছেন, সমগ্র ছবিটি মনে আনা চাই। তাহা হইলে দূরে গিয়াও মনশ্চক্ষে দর্শন হয়। ভক্তগণ তাই আজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম লক্ষ্মীমন্দিরে উপবিষ্ট। ভক্তগণ কিছুক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিয়া এবার জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকের সব দর্শন করিতেছেন। ভাণ্ডারঘর, মহাবীর, তুলসীকানন, কূপ, চম্পক বাগিচা, খামার, অন্ন মহাপ্রসাদ শুকাইবার স্থান, বাসুদেব বাবার আশ্রমাদি দর্শন করিলেন পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের। তারপর উত্তর-পশ্চিম দিকের সব দর্শন করিতেছেন — গোলাবাড়ি, গাঁদাপুষ্পকুঞ্জ, বৈকুণ্ঠ, সুফলগৃহ প্রভৃতি। এখানেও একটি কূপ আছে। রাজমিস্ত্রীগণ উহার সংস্কার করিতেছে। এইসব কূপের জলে ভোগাদি রন্ধন, আর মন্দিরাদি ধৌত করা হইয়া থাকে। সুফলগৃহে যাত্রীদিগকে পাণ্ডারা পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলে, তোমাদের তীর্থযাত্রা সুফল হইয়াছে। তখন যাত্রীগণ পাণ্ডাদিগকে যথাসাধ্য প্রণামী দেয়। কখনও প্রচুর অর্থ দিয়া যায়। বৈকুণ্ঠকূপে দ্বাদশ বৎসর পর জগন্নাথাদি দেবগণের পুরাতন কলেবর নিক্ষিপ্ত হয় এবং নূতন কলেবর বেদীর উপর পূজিত হয়। লোক বলে, তখন জগন্নাথের পুরাতন কলেবর হইতে একটি কৌটা বাহির করিয়া নূতন কলেবরের নাভিদেশে রাখা হয়। আর ইহাতেই নাকি শ্রীকৃষ্ণের দেহাবশেষ রক্ষিত থাকে।

বিনয়, মুকুন্দ ও জগবন্ধু এবার আনন্দবাজারে প্রবেশ করিলেন। বিনয় এক পয়সার ডাল ও অন্নপ্রসাদ খরিদ করিলেন। ভক্তগণ দক্ষিণ দিকে ফিরিতেছেন। তখন হঠাৎ শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি করছেন?

আনন্দবাজারের দুই দিকে দোকান পসরা। মন্দিরের সরকারী পসরাও আছে। এ সবেতেই মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। যাত্রীগণ উহা খরিদ করিয়া লইয়া যায় তাহাদের দেশে। মিষ্টান্নই বেশী লইয়া যায় আত্মীয় বন্ধুগণকে

উপহার দিবার জন্য। পূর্ব পংক্তির একটি ছোট দোকানের সম্মুখে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পোশাকে কি করিয়া তৈল লাগিয়াছে। তিনি বিনয়ের হাত হইতে মহাপ্রসাদ লইলেন এবং মাথায় ঠেকাইয়া উহা ভক্ষণ করিলেন। তৎপর ভক্তগণও প্রসাদ পাইলেন। পূর্ব দিকে হইতে আসিয়া ব্রহ্মচারী পার্থ চৈতন্যও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

এই পুরীতে ভক্তগণ ও জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ খাওয়াইবার একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। উহা একটি মহৎ কার্য বলিয়া মনে করে হিন্দুগণ। মন্দির-আঙ্গিনার ভিতরে ও বাহিরে মহাপ্রসাদ খাওয়ায় বিশ্বাসী যাত্রীগণ। কোন কোন ধনাঢ্য ভক্ত দশ হাজার পর্যন্ত লোককে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া থাকে। স্বতন্ত্র রন্ধন করিতে হয় না। মন্দিরকর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিলে উহা জগন্নাথের রন্ধনশালাতেই প্রস্তুত হয়। কোন্ কোন্ মহাপ্রসাদ খাওয়ান হইবে তাহা বলিয়া দিলে ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে ঐ সকল মহাপ্রসাদ যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। শোনা যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মহাসমাধির পর তাঁহার ভাণ্ডারায় প্রায় দশ হাজার লোককে মহাপ্রসাদ খাওয়ান হইয়াছিল।

ক্ষেত্রবাসী ভক্ত ও তপস্বীগণের সুবিধার জন্য পুরীতে অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। মন্দিরকর্তৃপক্ষকে অর্থদান করিলে মহাপ্রসাদ পাওয়া যায়। এই জন্য মধ্যাহ্নে একটি বিশেষ ভোগ হয়। তাহার নাম সত্রভোগ। এই ভোগের অন্ন বিভিন্ন মঠে আশ্রমে যায়। আর স্বতন্ত্র থাকিয়া যাহারা ক্ষেত্রবাস করে তাহারাও লইতে পারে। তিনশত টাকা মন্দিরে জমা দিলে এক হাঁড়ি ভাত, এক হাঁড়ি ডাল ও এক হাঁড়ি তরকারী পাওয়া যায়। ইহাতে একজন লোকের দুই বেলার পর্যাপ্ত আহার হইতে পারে। যে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেয় মন্দিরে সে ছাপান্ন প্রকারের প্রসাদ লইতে পারে। যাহাতে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বরের ভজনা করিতে পারে তাহার জন্যই এইসকল ব্যবস্থা। ভারত ধর্মপ্রাণ। তাই এইসকল উত্তম ও বিচিত্র ব্যবস্থা এখানে।

শ্রীম এইবার ‘শশী নিকেতনে’ ফিরিয়া যাইবেন। আনন্দবাজার হইতে বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছেন। সম্মুখে সিংহদ্বার। দ্বাদশটি সোপান অতিক্রম করিয়া শিবভৈরবকে উঁকি দিয়া দেখিয়া প্রণাম করিলেন যুক্ত করে। যেন বলিতেছেন, এবার আমাদের দর্শন শেষ হইয়াছে,

আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছি। সিংহদ্বারের মধ্যস্থলে শ্রীম দাঁড়াইলেন। আবার পশ্চাতে ফিরিয়া জগন্নাথকে পুনঃপ্রণাম করিলেন। অরুণস্তম্ভও পার হইয়া বড় দাণ্ডায় দাঁড়াইয়া একজন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিতেছেন রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে। পার্থ চৈতন্য নিকটে আর মনোরঞ্জন একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন।

মুকুন্দ, জগবন্ধু ও বিনয় কণিকা মহাপ্রসাদ ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। ইহাই পুরীর শ্রেষ্ঠ অন্নপ্রসাদ। বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে প্রস্তুত। বিনয় উহা লইয়া শশী নিকেতনে চলিয়া গেলেন।

৩

শ্রীম ফ্ল্যাগস্টাফের রাস্তায় চলিতেছেন। সঙ্গে মুকুন্দ, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু ও পার্থচৈতন্য। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন, জাজপেটার মঠ কোন্ দিকে? (পার্থ চৈতন্যের প্রতি) ওহে, তুমিই তো জান সব রাস্তা, এখানে থাক যখন। আচ্ছা, জাজপেটা বলে কেন? বিমল (পার্থচৈতন্য) উত্তর করিল, এদেশে করতালকে জাজ বলে। এই মঠে উহা খুব বাজান হয় পূজোয় ও আরতির সময়। বোধহয়, তাই সাধারণ লোকে এই নামে বলে এই মঠকে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই মঠ করেছেন বিখ্যাত সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা রাধারমণ চরণদাস বাবাজী। ইনি প্রথম যৌবনে ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে তিনি প্রথম জীবনে মূর্তিপূজা মানতেন না। পরে মেনেছিলেন। তাঁর এই পরিবর্তনের কথা একবার আমাদের তিনি নিজে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'শেষে পিসীমা যা বলেছিলেন তাই হলো'। পিসীমা ছিলেন প্রাচীন কালের মেয়েমানুষ, সরল বিশ্বাসী। তিনি তুলসী পূজা করতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি তুলসীতলায় ধূপ ও দীপ দিচ্ছিলেন। এই দেখে যুবক রাজেন (বাবাজী) পিসীমাকে বললেন, পিসীমা একি করছেন? এই গাছকে পূজা করে কি হবে? এতে কি আর ঈশ্বর আছেন? পিসীমা উত্তর করলেন — বাবা, তুমি এই আশীর্বাদ কর যেন তুলসীতলাতে আমার মতি থাকে। হাসতে হাসতে আমাকে এই কথা বলেছিলেন বাবাজী — শেষে পিসীমা যা বলেছিলেন তাই হলো। চরণদাস বাবাজীকে পুরীর লোক বড় বাবাজী

বলতো। একবার মন্দিরে দেখা হয়। তখন আমাকে ধরে নিয়ে আসেন এই মঠে!

শ্রীম মঠে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ — জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, মুকুন্দ ও ব্রহ্মচারী পার্থচৈতন্য। মঠের অধিষ্ঠিত দেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। বেদীর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিগ্রহ আছে। শ্রীম বারান্দায় দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন দক্ষিণ দিকে স্তম্ভের সম্মুখে। তারপর বায়ুকোণে মুখ করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন স্তম্ভ হইতে আধ হাতেরও কম দূরে। উঠিয়া উত্তর দিকে গিয়া জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করিতেছেন। তারপর বারান্দা হইতে নিম্নে নামিয়া বায়ুকোণে রন্ধনশালার নিকট গিয়া একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — এখানে পুরানো লোক আছেন কেউ?

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। ঐ ঘরে মহন্ত মহারাজ আছেন, অসুস্থ। আসুন, ফটকের বাম হাতের ঘরে উনি থাকেন। (ঐ ঘরে গেলে) এই মাদুরে বসুন। (অসুস্থ সাধুকে দেখাইয়া) এই ইনি প্রাচীন লোক, এই আশ্রমের মহন্ত।

শ্রীম (নমস্কারান্তে মহন্তর প্রতি) — ত্রিশ বছর পূর্বে আমি এই মঠে এসেছিলাম। বড় বাবাজী আমাকে জগন্নাথ মন্দির থেকে ধরে নিয়ে আসেন। উনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন, বরানগর থেকে। ওখানে পূর্বাশ্রম ছিল। ঠাকুরের কাছেই আমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। আমরা যখন প্রথম আসি তখন ললিতা সখীর* প্রথম অবস্থা। আচ্ছা, ওদিকের দেওয়ালের ওপাশে কোনও ঘর ছিল কি তখন?

মহন্ত — আজ্ঞে না। এই সব বাড়িঘর, মন্দির সব তাঁর প্রধান শিষ্য রামদাস বাবাজী করেছেন।

তিনি মঠের ইতিহাস বলার পর শ্রীম তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

মহন্ত (শ্রীম-র প্রতি) — আজ্ঞে, আপনি এ কি করছেন? আপনি যে কৃপা করে পায়ের ধুলো দিলেন এই যথেষ্ট। আমরা কৃতার্থ হলাম।

---

*একজন সাধু। গোপী ললিতা সখীর ভাবে ছিলেন।)

শ্রীম বাহির হইয়া আসিলেন। পাশেই চরণদাস বাবাজীর গৃহ। তিনি উহার ভিতরের সব দ্রব্যাদি দেখিতেছেন। সাধুরা ভিতরে যাইতে বলিলেন। শ্রীম ভিতরে যান নাই।

রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে ভোগারতি হইতেছে। শ্রীম অঙ্গনে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন। তাঁহার মাথার উপর চাদর। বেশ রৌদ্র। ব্রহ্মচারী পার্থচৈতন্য শ্রীম-র উত্তর দিকে আর জগবন্ধু, মনোরঞ্জন ও মুকুন্দ পশ্চাতে। পঞ্চপ্রদীপে আরতি হইতেছে। নাটমন্দিরে কাঁসর বাজিতেছে। পাঁচ মিনিট আরতি দর্শন করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শ্রীম দক্ষিণের ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন অগ্নিকোণে। একজন সাধুর সহিত কথা হইতেছে।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — আপনি এখানে কতদিন আছেন? আমি ত্রিশ বছর পূর্বে এসেছিলাম এখানে। এই ঘরটি ঠিক আছে। (পার্থচৈতন্যের প্রতি) তোমার তখন কত বয়স ছিল?

পার্থচৈতন্য — পাঁচ ছয় বছর হবে।

শ্রীম (বাবাজীর প্রতি) — আপনার বয়স কত?

বাবাজী — পঞ্চাশ।

শ্রীম — আপনি কতদিন এখানে?

বাবাজী — ছেলেবেলা থেকেই এখানে।

শ্রীম — তখন (শ্রীম যখন এই মঠে আসেন) তাহলে বয়স কম ছিল। এই ঘরটি ঠিক আছে। (অগ্নিকোণ দেখাইয়া) এইখানে বসে খেয়েছিলাম। ললিতা সখী তখন নূতন এসেছে। (হাতে কাপড় টানার অভিনয় করিয়া) এমন করে প্রসাদ দিত (হাস্য)। আর বাবাজীমশায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশন করাতেন।

শ্রীম মঠের বাহিরে আসিতেছেন। পুনরায় মহন্তর ঘরের সোপানে মস্তক সংলগ্ন করিয়া প্রণাম করিলেন। ফটকের উপরের চাতালে আবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

এখন দশটা।

একজন ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম কেন বারবার অত প্রণাম করছেন এই বৃদ্ধ বয়সে? অত প্রণাম করে পুণ্য সঞ্চয়, করার কি প্রয়োজন তাঁর, তিনি যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ, যিনি তাঁর পাদস্পর্শ

করেছেন। নিশ্চয়, ইহা ভক্তদের শিক্ষার জন্য, আর হয়তো এই আশ্রমবাসী সাধুদেরও শিক্ষার জন্য। তাঁদের আত্মসম্মান বৃদ্ধির জন্য।

৪

শ্রীম রাস্তায় চলিতেছেন আর ভক্তদের বলিতেছেন ঠাকুরের কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এ মঠে এসে এই কথাই মনে হচ্ছে, যার উপরই ঠাকুরের দৃষ্টি পড়েছে সে-ই অন্য রকম হয়ে গেছে। সংসার আলুনী লেগেছে। কতকগুলি সাধু হয়ে গেছে। কতকগুলি ঘরে আছে। কিন্তু সকলেরই ভিতর ফাঁক করে দিয়েছেন। তারা বোঝে, আগে ঈশ্বর পরে সব।

দেখ না, রাজেন ঘোষ পরে চরণদাস বাবাজী, অত বড় মহাত্মা! তা হবে না? ঠাকুরের ভালবাসা পেয়েছে যে! প্রথমে কর্ম নিয়েছিলেন কোন জমিদারীর সেরেস্তায়, নায়েব। তারপর কত কর্মের পর ঐ অবস্থা, সাধু হলেন। নানা প্রণালী দিয়ে তাঁর শক্তি প্রবাহিত — এখন তারা স্বীকার করুক বা না করুক। তাতে কি আসে যায়? ঠাকুর কি দুইটি লোকের জন্য এসেছেন? সকলের জন্য এসেছেন, জগতের জন্য এসেছেন। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্য মনের অতীত, তিনিই ঠাকুর। এ তাঁর নিজ মুখের কথা। শুধু কি বলেছেনই এই কথা? আবার আমাদের দেখিয়েছেনও যে তাঁর এই স্বরূপ! কেউ মনে না করে তিনি কেবল আমাদের জনকয়েকের জন্য এসেছেন। তাঁর ভাবনা জগতের জন্য। জগৎ রক্ষার জন্য তিনি অবতার হয়ে এসেছেন। কেউ আজ চিনেছে, কেউ কাল। কেউ অনেক পরে। ঠাকুরের মহাবাক্য — লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে। কেউ জেনে খেয়েছে, কেউ না জেনে খেয়েছে লঙ্কা। তার ঝাল যাবে কোথায়? লাগবেই।

যাঁরা অবতারের অন্তরঙ্গ তাঁদের তিনি তৎকালেই চিনিয়ে দেন নিজেকে। তারা তাঁর message (মহাবাণী) পালন করবে নিজ জীবনে, আবার প্রচার করবে অন্যের কাছে। তবে জগৎ উঠবে উপরে। তাই ভারতে ঠাকুরের আগমন। ভারত উঠলে জগৎ উঠবে।

একজন ভক্ত (স্বগত) — আজ বুঝলাম কেন চরণদাস বাবাজীর আশ্রম, তাঁর শিষ্য রামদাস বাবাজী আর ললিতা সখীকে ভাল লাগতো।

নবদ্বীপে দেখেছি, কি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করেন ললিতা সখী। মন আকৃষ্ট হয়। তেমনি রামদাস বাবাজীর কীর্তন! কি আন্তরিকতা, কি সরস নিষ্ঠা! এঁদের ভিতরও ঠাকুরের ঈশ্বরীয় শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, চরণদাস বাবাজীর ভিতর দিয়ে। তাই ভাল লাগতো।

মগ্নি মিশ্রের গৃহ। শ্রীম মগ্নি মিশ্রের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, দরজার সম্মুখে বেঞ্চে পূর্বাস্য। শ্রীম-র পার্শ্বে পার্থচৈতন্য। আর জগবন্ধু মুকুন্দ ও মনোরঞ্জন বসিয়াছেন উত্তর দরজার পূর্ব দিকে স্থাপিত তক্তাপোষে। শ্রীম-র সম্মুখে ভিতর বাড়ির প্রবেশ দরজা। সেই দরজা দিয়া শ্রীম-র দৃষ্টি অঙ্গনে পড়িয়াছে। অঙ্গন বড় নোংরা। শ্রীম-র চক্ষে ঐ দৃশ্য অসহনীয়। রৌদ্রে বসা যাক্ — বলিয়া উঠিয়া গিয়া তিনি বারান্দায় বসিলেন। বলিতেছেন — বাবা, আমার বসতে ভয় হচ্ছে। ওরা না এতো পড়েছে। এ কি রকম পড়া! আবার নিজে কবিরাজ। তাই বলে, 'physician, heal thyself' — বৈদ্যজী, আগে নিজের রোগ সারাও।

শ্রীম বার মিনিট বসিয়া আছেন। মগ্নি মিশ্রকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি এখনও আসেন নাই। মগ্নি মিশ্রের এক পুত্র আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন, আপনাদের প্রসাদ থাকে তো আমাদের একটু দিন্ না। পিতার আসার দেরী দেখিয়া পুত্র পুনরায় বাড়ির ভিতর গেলেন এদিকে দেরী হইতেছে দেখিয়া শ্রীম চলিয়া যাইতে চাহিলেন। পার্থচৈতন্যও বলিলেন, তবে আমরাও যাই — 'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা'। শ্রীম বলিলেন, হাঁ যাবে বৈ-কি। বাবা, এমন নোংরা জায়গা! এটা বুঝি এঁদের বাড়ি নয়। মেয়েরা অন্য বাড়িতে থাকে বুঝি?

বড় ছেলের প্রবেশ। তিনি সংবাদ দিলেন, বাবা একজন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিচ্ছেন — ভুলুয়া বাবাকে, তাই আসতে পারছেন না। এই কথা শুনিয়া শ্রীম বারান্দা হইতে বৈঠকখানায় আসিলেন, বাড়ির ভিতর যাইবেন। রাস্তায় ভুলুয়া বাবার সঙ্গে দেখা হইল। ইনি আহার সমাপন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীম বলিলেন, আপনার বই পড়েছি। ভুলুয়া বাবা বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, সে কি আপনার (কথামৃতের) মত! আপনি আমাকে স্নেহ করেন। তাই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

বৃদ্ধ কবিরাজ মগ্নি মিশ্র ভিতর বাড়ির এক ঘরের বারান্দায় একটা

তালপাতার ঠোঙ্গায় চিড়া ও মুড়কি প্রসাদ হাতে লইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীম-র কাছে যাইয়া তিনি এই প্রসাদ দিবেন বৈঠকখানায়। শ্রীম নিজেই তাঁহার কাছে আসিতেছেন দেখিয়া উনি উঠিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন ভিতরে, আর বসিয়া প্রসাদ পাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শ্রীম সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উঠিলেন এবং যুক্ত করে ঐ প্রসাদ লইলেন, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। ভক্তদের হাতেও প্রসাদ দিলেন। সকলে এখন বৈঠকখানার বারান্দায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীম-র হাতের প্রসাদ বেশী বলিয়া তিনি উহা মনোরঞ্জনের হাতে ঢালিয়া দিলেন। মনোরঞ্জন ও ভক্তগণ শ্রীম-র হাত হইতে এ মহাপ্রসাদ পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলেন আর সকলে পরমানন্দে উহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

একটি ছয় সাত বৎসরের বালক স্কুল হইতে বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেছে। নগ্ন দেহ, ময়লা কাপড় পরা। হাতে শ্লেট। পূর্ব দিকে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শ্রীম বলিলেন — দাও দাও, ওকে দাও। (ছেলেটির প্রতি) নাও নাও। বালক পলায়ন করিতেছে দৌড়িয়া। এক পথিক বালককে বলিতেছেন, নে না। সে আরও বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিতেছে। শ্রীম রাস্তায় অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন, কেমন ছেলে প্রসাদ নেয় না? বাড়ির লোকেরা শেখায় না কেন — প্রসাদ নিতে হয়, প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করতে নেই। জগবন্ধু বলিলেন, ঐ পথিক বলছে, সে ভয়ে পালাচ্ছে।

শ্রীম ভক্তসঙ্গে চলিতেছেন। ডান হাতে ঘুরিয়া কার্তিক সাঁই-এ প্রবেশ করিলেন। রাস্তার পূর্ব ধারে ঐ বালকের বাড়ি। ভক্তদের দেখিয়া সে দৌড়িয়া গৃহে উঠিতেছে। অন্তেবাসী দ্রুত অগ্রসর হইয়া বালককে ধরিয়া ফেলিলেন। আর ঐ বালকনারায়ণের হাতে প্রসাদের ঠোঙ্গা জোর করিয়া দিলেন। বালক নিতে নারাজ। রাস্তার একটি লোক বলিল — নে না, নে না, ঐ নে। বালক তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ ঠোঙ্গা গ্রহণ করিল।

ঐ বাড়ির উচ্চ বারান্দায় আর একটি দুই বৎসরের শিশু দাঁড়াইয়া আছে, সব দেখিতেছে — দিগম্বর পরমহংস। সে বিস্ফারিত নয়নে ভাইয়ের হাতের ঠোঙ্গাটির প্রতি চাহিয়া আছে। শ্রীম-র দৃষ্টি ঐ শিশুটির উপর পড়িল। অমনি ব্যস্ত হইয়া তিনি বলিতেছেন — দাও দাও ওকেও দাও। অন্তেবাসী বারান্দায় উঠিয়া ঐ শিশুনারায়ণের হাতেও প্রসাদ দিলেন।

শিশু ক্ষুদ্র দুইখানি হাত প্রসারিত করিয়া মহাপ্রসাদ লইতেছে আনন্দে।

তাহাদের জননী গৃহাভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া ফাঁক দিয়া এই আনন্দ-উৎসব দর্শন করিতেছে। বারান্দায় আরও একটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। বয়স ছয় সাত হইবে। গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ। তাহাকে দেখিয়াও শ্রীম বলিলেন — দাও, ওকেও দাও। এই বালকও শ্রীম-র কৃপা প্রসাদ পাইল।

একটি ভক্ত (স্বগত) — আশ্চর্য! এই মহাপুরুষের কৃপা এই শিশুদের উপরও! এই বালকগণ ধন্য! অযাচিত কৃপা! নিশ্চয় এদের সুকৃতি আছে। নচেৎ এই যোগাযোগ, এই সৌভাগ্য কি করে হলো? শুধু তো মহাপ্রসাদই লাভ করলো না এই বালকগণ! এর সঙ্গে অবতারের কৃপাও যে রয়েছে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদের মাধ্যমে। উপলক্ষ মহাপ্রসাদ।

মহাপ্রসাদকে ঠাকুর বলতেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই কলিকালে। যুক্তিবাদী স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, এ খেলে জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়। এটা বস্তুর গুণ, যেমন আফিং খেলে আঁটে, ত্রিফলা খেলে দাস্ত হয়। ঠাকুর নিজেও নিত্য এক দানা গ্রহণ করতেন। একে তো মহাপ্রসাদের গুণ অমোঘ। আবার তা দিচ্ছেন, অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীম। নিশ্চয় পারার মত কাজ করবে এই মহাপ্রসাদ ও অবতারের কৃপা এই বালকদের উত্তর জীবনে। সত্যই ধন্য বালকগণ!

শ্রীম ভক্তসঙ্গে দক্ষিণ দিকে চলিতেছেন। বড় রাস্তা পার হইয়া দক্ষিণের পল্লীর মোড়ে বিমল (পার্থ চৈতন্য) বিদায় লইলেন। ইনি ক্ষেত্রবাসী ব্রহ্মচারী! শ্রীম ধীরে ধীরে মুচিসাঁই পার হইয়া নিজ বাসস্থান শশী নিকেতনে প্রবেশ করিলেন।

এখন বেলা সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে।

শশী নিকেতন, পুরী।
৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৫ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
বুধবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

চৈতন্যময় পুরী

১

শ্রীম বারান্দায় বসিয়া আছেন বেঞ্চে দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম ঠাকুরের কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন ভক্তদের কাছে।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — এই যা দেখে এলাম ঘুরে ঘুরে, এই এক দিক। সংসারে সব জড়িয়ে আছে। এর উপরে আর এক থাক আছে। এদের কতক জ্ঞান আছে ঈশ্বর আছেন বলে। কিন্তু তাঁর কাছে চায় সব সংসারের সুখ। এর উপর আর এক থাক আছে। তারা চায় শুধু ঈশ্বরকে। ঈশ্বর আছেন, শুধু এই জ্ঞান নয়, ঈশ্বর অনন্তকালের বন্ধু, শান্তিসুখদাতা, তাঁর কাছে চাইলে অমৃতত্ব লাভ হয় — তাদের এই পরমার্থ জ্ঞানও আছে। কেউ চায় সংসার — এক কথায় যাকে ঠাকুর বলতেন কামিনী কাঞ্চন — পুত্র মিত্র ধন জন নাম যশ স্বর্গ ফর্গ। কেউ চায়, কেবল তাঁকে — 'God for God's sake' — জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস, বিবেক বৈরাগ্য সমাধি।

কেউ কেউ আদপেই তাঁকে জানে না। কি আশ্চর্য তাঁর মায়া! এই ভাবের লোকই বেশী সংসারে। আহার শয়ন মৈথুন ভয় — এই তাদের কাজ। কামাই কর আর খাও, আর খাওয়াও।

এরপর সকাম ভক্ত। তিনি আছেন, এ বোধ তার আছে। কিন্তু তাঁর কাছে চায় কেবল সংসারের সুখ। এরাও ভাল। কেন না, এরা ঈশ্বরকে মানে। কিন্তু এদের কাছে — আগে সংসারে, পরে ঈশ্বর।

এরপর নিষ্কাম ভক্ত, যেমন পাণ্ডবরা। এরা বিচারের দিক দিয়ে চায় ঈশ্বরকে। কিন্তু সংস্কারের দিক দিয়ে দেখে, মনে ভোগবাসনা রয়েছে। সংসার দুঃখময়, এ বোধ তাদের অনেকটা হয়েছে। ঈশ্বর সুখময় — এ

জ্ঞানও আছে। কিন্তু এতে প্রতিষ্ঠিত নয়। সংসারের সুখবাসনায় মনকে দোলায় কখনও। ঠাকুর এই থাকের লোককে বলতেন, যোগীভোগী। বলতেন, যেমন পাণ্ডবরা। ঈশ্বর আগে পরে সংসার, এই জ্ঞান তাদের হয়ে গেছে। আধা যোগ আধা ভোগ এদের।

এর পরের থাক যোগী। এরা কেবল ঈশ্বরকে চায়। মনের ভোগবাসনা তাদের অত চঞ্চল করতে পারে না। এদের মন বার আনা ঈশ্বরে। চার আনা সংসারে। এরা প্রায়ই সংসারত্যাগী।

যোগীভোগী আর যোগী, এই দুই থাকের ভক্তদের আদর্শ ঈশ্বরদর্শন। পথ ভিন্ন। যোগীভোগী একটু ঘুরে যায়। যোগী সিধে চলে যায়।

এই দুই থাকের জন্যই গীতার ঐ উক্তি — 'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।' (গীতা ৬-৪৫)।

এর উপরের থাক মহাযোগী, অবতারাদি। যেমন চৈতন্যদেব, ঠাকুর। উত্তরা প্রার্থনা করছেন কৃষ্ণকে — ''রক্ষ রক্ষ মহাযোগিন্।'

এ থাকের লোক বিরল। ভগবান নিজে কখনও কখনও এই রূপ ধরে আসেন। ঠাকুর তাই। তিনি পরমহংসগণেরও পূজনীয়, পরমহংসের পরমহংস।

অবতারের পার্ষদগণের মধ্যে কেউ কেউ এই থাকের লোক, দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। যেমন রিজার্ভ অফিসার। অবতারের কৃপায় এঁদের আগে ফল, পরে ফুল — ঠাকুর বলতেন। এঁরা কষ্ট করে সিদ্ধ নন, যুগে যুগে সিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ। যখনই অবতার আসেন তখনই সঙ্গে নিয়ে আসেন ওঁদের।

এইসব তীর্থে এলে এই জ্ঞান হয়। ঈশ্বরই জীবের বদ্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা করছেন। তীর্থে এই দুই রকম লোকই থাকে। দেখ না, এই শ্রীক্ষেত্রে একদিকে চৈতন্যদেব রয়েছেন। তাঁর পার্ষদরা কেউ কেউ রয়েছেন। তাঁদের ভাব এখানে জীবন্ত। আবার অসংখ্য সাধক ভক্ত আছেন। অন্যদিকে সব বিষয়াসক্ত লোক। একদিকে চৈতন্যদেব মহাভাবে নিমগ্ন — দেশকালাতীত অবস্থা। অন্য দিকে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে মগ্ন অন্য লোক। উভয় দিকেই identification (একাত্মতা) যোল আনা। চেতন ও জড়ের খেলা। এই খেলাটিকে ঠাকুর বলতেন জগৎলীলা। এই

খেলার মধ্যে তিনি নিজে অবতার হয়ে এসে গুটিকয়েক লোকের কাছে এই তত্ত্ব প্রকাশ করে যান। তাদের এই খেলাটি বুঝিয়ে যান। এঁরা আবার অপরকে বলেন। যাদের বহু জন্ম ধরে আত্মজ্ঞানের চেষ্টা আছে তারাই বোঝে। তারাই ধরে থাকে মোক্ষের দিক। এই বদ্ধ মোক্ষ খেলা, এই জগৎলীলা চলছে অনন্ত কাল।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এইসব তীর্থে এসে সব তন্ন তন্ন করে দর্শন করতে হয়। মনটাকে অপর দিকে নেবার চেষ্টা করতে হয়। মন্দিরে গেলে প্রতি ধূলিকণাটি পর্যন্ত দর্শন করতে হয়। আর ভাবতে হয়, এইসব ধূলিকণা ভগবানের অবতারের চরণরেণুতে জীবন্ত হয়ে আছে। সকল মন্দিরের সব দেখতে হয়। ধ্যান করতে হয়। দীর্ঘকাল থাকতে হয়। ওখানকার পরমাণু সব পবিত্র, জাগ্রত। কত কাল থেকে কত কত লোকের ঈশ্বরীয় চিন্তা রয়েছে ওখানে জমাটবাঁধা হয়ে — আকাশে বাতাসে ভূমিতে শূন্যে।

চৈতন্যদেব যেসব চিন্তা করতেন ঐ সবই রয়েছে, তাই সব চৈতন্যময়। যাদের কতক চৈতন্য হয়েছে, সাধুসঙ্গ হয়েছে, এসব স্থানে এলে তাদের 'নিজ নিকেতনে'র কথা মনে হয়। ঈশ্বরের কথা মনে হয়। মনে হয়, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' — আমরা ঈশ্বরের অংশ।

কিন্তু তাঁর মহামায়া আবার ভুলিয়ে দেয়, টেনে নিয়ে যায় সংসারে। ঘোর স্বপ্নে ফেলে দেয়। তাই ঠাকুর সর্বদা প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।'

২

এখন বেলা বারটা। শ্রীম উঠিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ওখান হইতেই সকলকে বলিতেছেন, সমুদ্র নেয়ে আসুন চট্ করে, যাঁরা যাবেন।

মন্দিরে আজ শ্রীম-র জামা ও চাদরে তেল লাগিয়াছে। তিনি উহা লইয়া বাহিরে আসিলেন। জগবন্ধুর হাতে জামাটা দিলেন। বলিলেন, এর

মধ্যে ঠাকুরের প্রসাদী ফুল আছে। এমন করে ধরতে হবে যাতে মাটিতে না লাগে, পায়ে না লাগে। মনোরঞ্জনকে দিলেন চাদরখানা। জগবন্ধু বলিলেন, চাদরে বেশী তেল লেগেছে। সাবান দিয়ে একটু রাখলে শীঘ্র উঠে পড়বে। শ্রীম উত্তর করিলেন, না না। আমার তর সইবে না। এখনই চাই।

ভক্তগণ কূপতটে সাবান দিয়া কাপড়ের তেল তুলিতেছেন। শ্রীম শৌচাগারে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম-র পরণে চারখানা গামছা (চৌখুপী গামছা), হাতে ছোট মোটা মগ। গলায় জড়ান আধখানা কাপড়।

এখন অপরাহ্ন সাড়ে তিনটা। জগবন্ধু, বিনয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তগণ ইতিমধ্যে মন্দিরে আসিয়াছেন শ্রীম-র নির্দেশে। মধ্যাহ্নে শ্রীম বলিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া মন্দিরে থাকা উচিত। আর তন্ন তন্ন করিয়া সব দেখা উচিত। গর্ভমন্দির এখনও খুলে নাই। ভগবান বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তগণ নাটমন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত দেব-দেবীর চিত্রপট দেখিতেছেন। ভিতরের ছাদে নানা রঙে অঙ্কিত দশাবতার ও অনন্তশয়ন দর্শন করিলেন। তারপর বটে-কৃষ্ণ, বসুদেবকোলে-কৃষ্ণ, বালকৃষ্ণ, ব্যাসনারায়ণ, গণেশজননী, সীতারাম, হনুমানের স্কন্ধে রামলক্ষ্মণ, রাসলীলা, ধ্রুবের তপস্যা, জলে-প্রহ্লাদ, কৃষ্ণজন্ম, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি ছবিও একে একে দেখিতেছেন। এতদিনও দেখিতেন এই সব ছবি। কিন্তু আজ এগুলি দেখিলেন অধিকতর মনোযোগের সহিত। মনে একটি নূতন অনুরাগাঞ্জন শ্রীম লাগাইয়া দিয়াছেন, তাই সব দ্রব্যে নূতন ও নিবিড় আকর্ষণ। যেমন বিষয়ীর ভালবাসা অর্থে, তাই অর্থলাভের উপায়ের উপর তাহার অধিকতর মনোযোগ, তেমনি ভক্তগণের আজ সেইরূপ ভালবাসা ও আগ্রহ এইসব দর্শনে।

ভক্তগণ ভগবানের কৃপাভিখারী। শ্রীম বলিয়াছেন, ভগবৎ লীলা, ভগবৎ গুণগানে, ভাগবতী দ্রব্যে মনকে রাঙাইয়া লইতে পারিলে ভগবৎ কৃপা লাভ হয়। সেই কৃপালাভের অনুরাগে আজ অতি সামান্য জিনিসও প্রিয় ও মধুর বলিয়া ভক্তদের বোধ হইতেছে।

মন্দির পরিবেশের ভিতর একজন বৃদ্ধ মহাপুরুষের কুটীর। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত রামায়ত সাধু। নাম বাসুদেব বাবাজী — যথার্থ

ভগবৎপ্রেমিক মহাত্মা। ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। তিনি একখণ্ড তক্তার উপর বসিয়া সম্মুখে আসনে অবস্থিত শ্রীমদ্ ভাগবতের বিরাট পুঁথি নিত্য নীরবে পাঠ করেন। তাঁহার কোমরে বাঁধা একটি বস্ত্র, দীর্ঘকাল সোজা হইয়া বসিলে ব্যথা হয়, তাই। গৌরবর্ণ, আর মুখমণ্ডলে প্রশান্তি জমাটবাঁধা, যেন একটি পাকা আম। তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের খুব ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। রাখাল মহারাজ, শ্রীম প্রভৃতি পার্ষদদের সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করেন। বয়স আশির সন্নিকট। বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পুরীতে বাস করিতেছেন। তিনি নিত্য বহু ভক্তকে উদর পূর্ণ করিয়া মহাপ্রসাদ আহার করান। কৃপাসিন্ধু বাসুদেব বাবা নিষ্ঠা ও ভক্তির স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার নিকট পাঁচ মিনিট শ্রদ্ধার সহিত বসিলে চঞ্চল মন স্থির হইয়া নিষ্ঠা ভক্তিতে রূপায়িত হয়। আর ইহার প্রভাব অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শ্রীমন্দিরে সাতবার যান এবং শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া হাতে চামর লইয়া ভগবানকে ব্যজন করেন সাতবার ভোগারতির সময়। প্রত্যহ সকালে নাটমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসিয়া ধ্যান জপ করেন। দেখিলে মন হয়, তিনি আলস্যকে জয় করিয়াছেন। কি প্রসন্ন বদন!

ভক্তগণ বাসুদেব বাবাকে প্রণাম করিলেন। তিনি স্মিত হাস্যে আশীর্বাদ করিয়া শ্রীম-র কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আর উত্তম মহাপ্রসাদ দিয়া ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। বেশীক্ষণ থাকিলে পাঠে ব্যাঘাত হয়। রাত্রিতে স্বর্গদ্বার রোডের নিজের আশ্রমে চলিয়া যান। সারাদিন মন্দিরে থাকেন।

এইস্থানে ভক্তগণ শ্রীযোগেশ ঘোষকে দেখিতে পাইলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত শরণাগত অন্তরঙ্গ শ্রীবলরাম বসুর জামাতা। যোগেশ ঘোষ পূর্ব দিকে দেওয়ালে মুখ করিয়া মহাপ্রসাদ ডাল ভাত তরকারী ভক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। এখন বাণপ্রস্থীরূপে পুরীতে তপস্যানিরত। আর দিনান্তে এখানে আসিয়া একবার মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আহার করেন। কখনও বা শ্রীম-র নিকট যান। তাহার বাসগৃহ এখন ভবানীপুরের গদাধর আশ্রম — পরলোকগত পুত্র গদাধরের নামে। ইহা রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখা কেন্দ্র।

বাসুদেব বাবার আশ্রমে এক মণেরও অধিক অন্ন মহাপ্রসাদ মেঝেতে

রৌদ্রে শুকান হইতেছে। ছোট বড় থলিতে পূর্ণ করিয়া বাসুদেব বাবা ভক্তদের উহা উপহার দেন।

ভক্তগণ এই শুষ্ক মহাপ্রসাদের রাশি দেখিয়া ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য এই ভারত! কি অদ্ভুত কৌশল দেখি এদেশের আচার্যদের জনসাধারণের ভিতর ভক্তি জাগ্রত রাখিবার! ভারতময় পাণ্ডাগণ এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করে। বাল্যকালে দেখিয়াছি, দেখা হইলেই পাণ্ডাগণ আমাদিগকে মহাপ্রসাদ দিতেন, আমরাও তাহা আহার করিতাম সানন্দে। গুরুজনগণ বলিতেন — নাও, খাও — ইহা জগন্নাথ ভগবানের মহাপ্রসাদ। ইহা খাইলে ভাল হয়। কি ভাল হয়, তাহা জানিতাম না। শ্রীম-র মুখে বারংবার মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি ও আচরণ দেখিয়া এতদিনে উহার মাহাত্ম্য উপলব্ধ হইয়াছে। আর বুঝিতেছি, কত দূরদর্শী এ দেশের আচার্যগণ, কত দূরপ্রসারী তাঁহাদের প্রচারবিধি, আর কি অমোঘ এই একদানা মহাপ্রসাদের ফল! এই একদানা মহাপ্রসাদের ভিতর দুর্লভ বস্তু জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস নিহিত। তাহা হইলে সব প্রসাদেই এই জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস নিহিত থাকে। ভক্তি ও ভগবান এক — ঠাকুরের কথা। প্রসাদ খাইলে ভক্তিলাভ হয়। তাহা হইলে প্রসাদ ও ভগবান এক। হায়, আজকাল ইংরেজীশিক্ষার গুণে এই অতি সহজ ও সরল ভক্তিলাভের উপায়টি বিস্মৃত। শ্রীম অনেকবার ভক্তদের বলিয়াছেন মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর নিত্য সকালে একদানা মহাপ্রসাদ খেতেন অন্য কিছু খাওয়ার পূর্বে। একটি ছোট সালু কাপড়ের থলিতে থাকতো তাঁর বিছানার পাশে পশ্চিমের দেয়ালে। আমাদেরও দিতেন। একদিন নরেন্দ্রকেও দিলেন। নরেন্দ্র তা খেতে চায় নি। বলে — এ শুকনো ভাত, অপরিষ্কার জিনিস। ঠাকুর তখন তাকে বলেন, তুই দ্রব্যগুণ মানিস — আফিং খেলে আঁটে আর ত্রিফলায় দাস্ত হয়? নরেন্দ্র উত্তর করলো — হাঁ, তা মানি। তখন ঠাকুর বললেন, এ-ও তেমনি। এই মহাপ্রসাদ খেলে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস লাভ হয়। তখন নরেন্দ্র নির্বিচারে উহা খেল। ঠাকুরের কথায় তার পূর্ণ বিশ্বাস। ঠাকুর সত্যবাদী আর এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাই ঠাকুর বলতেন, কলিতে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। বলতেন, কলিতে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের রজঃ,

আর গঙ্গাজল — সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

৩

ভক্তগণ জগন্নাথের রন্ধনশালা দর্শন করিতেছেন। কি বিরাট ব্যাপার! এখানে সহস্র সহস্র লোকের ভোজন-উপযোগী অন্নাদি রন্ধন হয়। কোনও গৃহস্থগৃহে দুই চারিদিনের উৎসব সকলকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে। আর এখানে নিত্য এত অন্ন রন্ধন করা হইতেছে নিঃশব্দে, কত যুগ ধরিয়া। এই বিষয়টি ভাবিলেও এখানে ভগবানের নিত্য আবির্ভাব প্রমাণিত হয়।

এই বিরাট রন্ধনশালায় বিলাতি কুকারের প্রথায় রন্ধন হয়। কেহ কেহ বলেন, এই পাকপ্রণালী দেখিয়াই ইক্‌মিক্ কুকারের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে রন্ধন। সকলের নিম্নের হাঁড়িতে থাকে চাল, কখনও দশ সেরেরও অধিক। তাহার উপর অনুরূপ লবণহীন ডালের হাঁড়ি ও তরকারীর হাঁড়ি। এই চালের বড় হাঁড়ির নিচে কাঠের জ্বাল। এই রন্ধনশালায় সাতবার রন্ধন হয়, সাতবার ভোগ। নিত্য ছাপ্পান্ন প্রকারের দ্রব্যে ভোগ হয়। অন্নব্যঞ্জনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রকারের মিষ্টান্নাদিও নিত্য এই রন্ধনশালায় প্রস্তুত হয়। নিত্য রন্ধন, নিত্য ভোগ, নিত্য মহাপ্রসাদ — সাতবার। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করিলে যে কোনও লোক এই মন্দিরে সহস্র সহস্র লোককে মহাপ্রসাদ খাওয়াইতে পারে পরিতোষপূর্বক। জগন্নাথ বিরাট, নিত্যভোগও বিরাট। জগতে এই ব্যবস্থা আর কোথাও নাই।

ভক্তগণ জগন্নাথের স্থান ও পানীয় জলের বিশাল কূপতটে উপনীত। পাশেই ঢেঁকিশালা, ভাণ্ডার ও ইন্ধনশালা। সবই বিরাট। এই সকল দ্রব্যই জগন্নাথের জমিদারী হইতে আসে। হাঁড়ির জন্য কুম্ভকারের গ্রাম রহিয়াছে। ইহারা বৃত্তিভোগী। ব্রাহ্মণদের ষোলটি গ্রাম। তাঁহারা পূজা, মন্দিরমার্জনা, রন্ধনাদি সব কার্য করেন। আর পূজাদির ব্যাপারে সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহার সমাধান করেন। এক মতে আছে, ১৪৮০ জন সেবকের দ্বারা জগন্নাথের যাবতীয় কর্ম শেষ হয়। কেহ বলে ৩০০ জন, অন্যমতে ১২৮ জন ব্রাহ্মণ নিত্যসেবায় আবশ্যক। মতভেদ থাকিলেও জগন্নাথ মন্দিরের সেবা পূজা যে বিশাল — এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। জগন্নাথ বিরাট, তাঁহার ব্যবস্থাও বিরাট।

মন্দির এখনও খুলে নাই। তাই ভক্তগণ আধ মাইল দূরবর্তী মহর্ষি হরিদাসের সাধনপীঠ ‘সিদ্ধ বকুলে’ গেলেন। কেন যেন এ স্থান ভক্তদের মন এত আকর্ষণ করে। পাঁচশত বৎসরের বকুল বৃক্ষটিতে বুঝি চৈতন্য হরিদাস জীবন্ত!

মন্দিরের কপাট খোলার শব্দ পাইয়া ভক্তগণ মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াছেন বটেকৃষ্ণ দর্শন করিয়া। শয়নমন্দিরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দর্শন করিতেছেন। আজ নূতন দর্শন। নির্মুক্ত অঙ্গ পূজারী বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিতেছে। প্রথমে কয়েক খণ্ড সালু দিয়া দেবমূর্তিদের অঙ্গ আবরণ করা হইয়াছে। তারপর সবুজ রঙের বালাপোষ অঙ্গে স্থাপিত — শীতকাল তাই। তাহার উপর ফিকে গোলাপী রংয়ের বনাত বিগ্রহদের সম্মুখে লম্বমান। মস্তকে সালুর কম্ফোর্টার। তদুপরি জরির কাজকরা মূল্যবান বস্ত্র। গলদেশে সুগন্ধী বিশাল পুষ্পমাল্য। বড় সুন্দর দর্শন, যেন জীবন্ত!

ভক্তগণ দর্শন করিতেছেন আর শ্রবণ করিতেছেন পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীম-র মুখে শ্রুত ঠাকুরের কথা — ‘আমিই জগন্নাথ।’ আর প্রার্থনা করিতেছেন — প্রভো, ভক্তি বিশ্বাস দাও। অন্তরে বুঝাইয়া দাও ঠাকুরের মহাবাক্য। ইহা বুঝিতে পারিলে মানবজীবন ধন্য। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব তোমাকে নিত্য দর্শন করিতেন সাক্ষাৎ জীবন্ত, জাগ্রত ভগবানরূপে। কৃতার্থ কর আমাদিগকে তোমার চৈতন্যঘন সচ্চিদানন্দরূপে এই মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া। ধন্য কর আমাদের মানবজীবন!

ভক্তগণ বিমলাপীঠে আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া নাটমন্দিরে বায়ুকোণে বসিয়া দেবীকে সমস্বরে পাঁচটি সঙ্গীতে অর্চনা করিতেছেন। বেদমন্ত্রতুল্য সবগুলি সঙ্গীতই ঠাকুরের মুখে গীত। প্রথম, ‘কে গো আমার মা কি এলি।’ দ্বিতীয়, ‘গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।’ তৃতীয়, ‘ভবে সেই তো পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।’ চতুর্থ, ‘দেখ না চেয়ে ন্যাংটা মেয়ে করিতেছে কি কারখানা।’ পঞ্চম, ‘মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।’

এইবার অন্যান্য মন্দির দর্শন করিয়া পুনরায় জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিলেন উত্তরের প্রবেশপথে। শয়নমন্দিরে দক্ষিণের দরজার নিকট দ্বিতীয়

স্তম্ভের নিম্নদেশে বসিয়া মুকুন্দ ধ্যান করিতেছেন। অপর ভক্তগণ করজোড়ে দর্শন ও প্রার্থনা করিতেছেন — 'প্রসীদ দেব, প্রসীদ'। কিছুক্ষণ পর পুনরায় ভক্তগণ উত্তরের প্রবেশপথেই বাহিরে আসিলেন। মুকুন্দ বিনয় ও মনোরঞ্জন সত্রভোগমন্দির ডান হাতে রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশের দ্বিতীয় ফটকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর একজন ভক্ত চৈতন্যচরণ-মন্দিরে প্রণাম করিয়া গতকল্য শ্রীম যে পথে আনন্দবাজারে গমন করিয়াছিলেন সেই পথগুলি পুনরায় দর্শন করিয়া অপর ভক্তগণের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। দ্বিতীয় ফটকে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ চন্দ্র দর্শন করিতেছেন। কাল পূর্ণিমা গিয়াছে। চন্দ্র আজও প্রায় পূর্ণ। কি নির্মল আকাশ! কি নির্মল চন্দ্রালোক! শ্রীম-র কৃপায় ভক্তগণের হৃদয়েও চৈতন্যচন্দ্রালোক, আর বাহিরে এই 'নক্ষত্রাণামহম্ শশী' (গীতা ১০-২১)। কি আনন্দ, কি শান্তি!

ভক্তগণ ফ্ল্যাগস্টাফের রাস্তায় চলিতেছেন — মুকুন্দ, বিনয়, জগবন্ধু ও মনোরঞ্জন। সানন্দ হৃদয়ে ভাবিতেছেন, কি আনন্দ আজ আমাদের! আনন্দধামে নিবাস — শান্তি ও আনন্দে মুখরিত জগন্নাথমন্দির! সাগর — তাহাও সেই বিরাট আনন্দময়ের দ্যোতক। চৈতন্যদেবের স্মৃতি, তাহাও মনকে কল্পনার চক্ষুতে টানিয়া লইয়া যায় সেই দূর অতীতে শ্রীভগবানের নরলীলার আনন্দোৎসবে। অতীত ও বর্তমানের সুদৃঢ় প্রাচীর ভক্তগণের নিকট অন্তর্হিত। তাঁহাদের মন এক অবাধ উন্মুক্ত আনন্দসাগরে নিমজ্জিত। তাঁহাদের শরীর নিমজ্জিতপ্রায় পূর্ণচন্দ্রকরসাগরে।

কেহ আরও ভাবিতেছেন, এই পথে একদিন চৈতন্যদেব চলিয়াছেন। তাঁহার চরণস্পর্শে পথের রজঃরাশিও পবিত্র জীবন্ত ও আনন্দময়। সবই আনন্দময়। তাই ভক্তদের হৃদয় মধুর, চন্দ্রকর মধুর, মধুর শশী নিকেতন। এখানে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীম। রাত্রি এখন আটটা।

রাত্রি নয়টা। শ্রীম-র ধ্যান শেষ হইয়াছে। এখন আহার করিতে যাইতেছেন অন্দরমহলে। হলঘরে বসিয়া আছেন পার্থচৈতন্য, আর মুকুন্দ, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু। শ্রীম বলিলেন — বিমল, তুমি এদের শোনাও ঠাকুরের কথা। আমরা খেয়ে আসছি।

শ্রীম দক্ষিণের শয়নঘরের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। এখানে বসা বিনয় ও জগবন্ধু। টেবিলের উপর হ্যারিকেন লণ্ঠন। তাহার আভায় একজন

লিখিতেছেন। আর বিনয় ছাড়াইতেছেন একটি পেঁপে, ভুবনেশ্বর মঠের উপহার। তাঁহার হাতে কাজ, মুখে অনুচ্চ বক্‌বকানি। এতে আছে সমালোচনা, কিন্তু বিষোদ্‌গার নাই। তাই মধুর, যেন চাটনি। একজন লিখিতেছেন, আর উপভোগ করিতেছেন এই নির্মল মধুর চাটনি।

বিনয় রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। নৈশ আহার্যের তরকারী কাটিতেছেন। আর মুখে তাঁহার ঐ সুমধুর বক্‌বকানি। সুখেন্দুর প্রবেশ। তিনিও মনে উপভোগ করিতেছেন ঐ উপভোগ্য চাটনি। মুখে তাঁহার মধুর হাসি।

আহারান্তে শ্রীম ফিরিতেছেন ঐ রন্ধনগৃহের পথে। পাশের ঘরে একজনকে লিখিতে দেখিয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কি লিখছেন? সুখেন্দু বুঝিতে পারিলেন না। বিনয় উত্তর করিলেন, ডাইরী লিখছেন।

শ্রীম সুখেন্দুর নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে সদাচারের উপদেশ দিতেছেন। উদ্দেশ্য সুখেন্দু, কিন্তু লক্ষ্য সকল ভক্তবৃন্দ। শ্রীম বলিতেছেন, শুদ্ধভাবে ও সদাচারে সব রাঁধতে হয়। ভক্তরা খাচ্ছেন কিনা! তাঁদের হৃদয়ে ভগবান। তাঁদের মুখে তিনি খান। তাই সদাচারের দরকার। আবার নিবেদন করে সব খেতে হয়। ঈশ্বরকে নিবেদন করে না খেলে — গীতায় ভগবান বলেছেন, চুরি করে খাওয়া হয়। তাই শুদ্ধভাবে রান্না আর নিবেদন করে আহার আবশ্যক।

ভক্তদের ভোজন শেষ হইল রাত্রি সওয়া এগারটায়। একজন ভক্ত মনোরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন জগন্নাথমন্দিরে। উদ্দেশ্য, শয়ন ও শৃঙ্গার দর্শন, রাত্রি বারটায়। দ্বাররক্ষক প্রথমে তাঁহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তাঁহাদের 'পাশ' নাই। পরে কি ভাবিয়া যাইতে দিল। আন্তরিক ভক্ত ভগবানের প্রিয়। তাই কি হৃদয়বিহারী ভগবান জগন্নাথ দ্বাররক্ষকের মন পরিবর্তন করিলেন?

একটি সুবৃহৎ রৌপ্য ছত্রের নিম্নে রৌপ্য পালঙ্কে শায়িত লক্ষ্মীনারায়ণ, অচল জগন্নাথের সচল প্রতিনিধি, উৎসব বিগ্রহ। নানা সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে ও চন্দনে বিভূষিত তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ। শৃঙ্গার, ভোগ, আরতি ও শয়ন — মধুর ও মনোমুগ্ধকর। দেবদাসীর সুললিত নৃত্যগীতের সহিত পূজারী

আরতি করিতেছে। ঐ সঙ্গে বাজিতেছে ঢোলক ও সাত জোড়া বৃহৎ করতাল। একজন ভক্ত বাঁশের বাঁশরিতে বাজাইতেছে জয়দেবের 'জয় জগদীশ হরে।' যেমন সুন্দর ও সুমধুর, তেমন মনোহর ও মনোরঞ্জক এই দৃশ্য। আরতির পর শয়ন।

ভক্তগণ শশী নিকেতনে ফিরিয়াছেন। রাত্রি এখন দেড়টা। একজন গেলেন শৌচাগারে। তাঁহার এক হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন অন্য হাতে মগে শৌচজল। হঠাৎ হ্যারিকেন প্রজ্জ্বলিত হইল। দ্বিতল হইতে গিন্নী-মা উচ্চকণ্ঠে বলিলেন — জল ঢেলে দাও, জল ঢেলে দাও। যেন দৈববাণী এই গভীর রজনীতে।

আজ রজনীতে একটি ভক্ত স্বপ্ন দেখিতেছেন, মনোরঞ্জনের সহিত তিনি ভারতের সকল দেবমন্দির, সকল দেবতা দর্শন করিতেছেন সকল তীর্থে।

শশী নিকেতন, পুরী।
৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৫ই পৌষ ১৩৩২ সাল।
বুধবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।